নজরুল জীবন ও পালিত কন্যার স্মৃতিকথা

শেখ দরবার আলম

নার্গিস: জীবন ও দাম্পত্য কন্যার স্মৃতিকথা

শেখ দরবার আলম

নজরুল একাডেমী
ঢাকা-১০০০

www.pathagar.com

প্রথম সংস্করণ :
ভাদ্র ১৪০৫
আগস্ট ১৯৯৮

প্রকাশক :
মিন্টু রহমান
সাধারণ সম্পাদক
নজরুল একাডেমী
নজরুল ভবন
বেলালাবাদ, মগবাজার,
ঢাকা-১০০০। ফোন : ৪১৬০২৯

প্রচ্ছদ :
প্রবীর সেন

অক্ষরবিন্যাস ও মুদ্রণে :
শেখ কামরুল হাসান
মৌসুমী প্রিন্টার্স
১৫ মীরপুর রোড, ঢাকা।
ফোন : ৮৬৩৫০২, ৫০৪৬৯৯

দাম ঃ এক শ' টাকা

পঞ্চাশ টাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচনা

কবি কাজী নজরুল ইসলামের যে একজন পালিত কন্যা ছিলেন সেটা ১৩৯৪-'র ১১ জ্যৈষ্ঠ (১৯৮৭-'র ২৬ মে) মঙ্গলবার তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের আগে কেবল কবির পৌত্রী খিলখিল কাজীর কাছেই শুনেছি। কোনো গ্রন্থে বা পত্র-পত্রিকায় কবির পালিত কন্যার নাম, তাঁর কোনো কথা বা তাঁর বিষয়ে কোনো উল্লেখ এ যাবৎ আমি পাই নি।

শান্তিলতা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হওয়ার দু'দিন পর ঢাকার বনানীতে খিলখিল কাজীদের বাসায় আমি তাঁর সাক্ষাৎকার নিই। দু'টো নব্বুই মিনিটের অডিও ক্যাসেটে। দু'টো টিডিকে নাইনটিতে। মোট এক ঘন্টা আশি মিনিটের অর্থাৎ তিন ঘন্টার সাক্ষাৎকারে।

সেই সাক্ষাৎকার ঢাকার দৈনিক ইনকিলাবের 'শিল্প-সংস্কৃতি' পৃষ্টায় ধারাবাহিকভাবে ১৯৮৯ -'র ২৭ জানুয়ারী থেকে ছাপা হয়েছে। ৭ এপ্রিল ১৯৮৯ পর্য্যন্ত। শিল্প-সংস্কৃতির পাতাটা তখন ছাপা হ'তো প্রতি শুক্রবারে। এই লেখাটা তখন অনেকে খুব আগ্রহ নিয়ে পড়তেন ব'লে আমাকে জানিয়েছেন।

১৯৮৯-'র ২৭ এপ্রিলে যখন এটার ছাপা শুরু হয় তখন দৈনিক পত্রিকায় এর সেই প্রকাশনার সূচনা লগ্নে বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে উল্লেখ ক'রেছিলাম:

পালিত কন্যা শান্তিলতার চোখে কবির পারিবারিক জীবন কেমন ছিল? কবির জীবন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল কেবল সেটুকুর জন্য নয়, নজরুল জীবনের অনেক অলিখিত কথা জানা এবং জানানোর জন্যই প্রয়োজনীয় এই সাক্ষাৎকার।

কী খেতে ভালোবাসতেন কবি? কী পরতেন? কোন্ কোন্ সময়ে কেমন ছিলেন তিনি? কোন্ কোন্ ঠিকানায় থাকতেন? পারিবারিক জীবনে কেমন মানুষ ছিলেন তিনি, এ রকম অনেক অজ্ঞাত কথা পাওয়া যায় তাঁর সাক্ষাৎকারে।

তারিখ -তথ্য, উপাদানাদি সময়ানুক্রমিক সাজিয়ে পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য কোনো নজরুল জীবনী আজো লেখা হয় নি। 'অজানা নজরুল'-এ আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি নজরুল জীবনী বিষয়ে কাজ কী বিশাল পরিমাণে করা যায় এবং করা উচিত, এবং কাজ কত বাকী! তবু সমস্ত কাজটা একজনের হাত দিয়ে হওয়ার নয় এবং এক জনের কাছ থেকে কিংবা এক জায়গা থেকে পাওয়ার-ও নয়।

www.pathagar.com

শান্তিলতা দেবীর সাক্ষাৎকার 'অজানা নজরুল' প্রকাশের আগেই নিয়েছিলাম। তবু এই সাক্ষাৎকার আরো অনেক কিছুর মতোই উক্ত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নয়। সেটাই এখন এই কাগজ মারফৎ পাঠকের খিদমতে পেশ করছি।"

দৈনিক কাগজে প্রকাশিত সেই ধারাবাহিক সাক্ষাৎকারটিই এখন নজরুল একাডেমীর তরফে আমরা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করছি।

যাঁরা নজরুল চর্চা করবেন, যাঁরা নজরুল জীবনী লিখবেন, এই গ্রন্থের প্রয়োজন তাঁদের সবারই হবে।

দৈনিক ইনকিলাবে এই সাক্ষাৎকারটি যখন ছাপা হয় তখন শান্তিলতা দেবী জীবিত ছিলেন।

এখন তাঁর ছেলে-মেয়েরা আছেন। তাদের ঠিকানা এই গ্রন্থে শান্তিলতা দেবীর সাক্ষাৎকার অংশেই রইল। তাদের কাছ থেকে এবং তাদের সহযোগিতায় নজরুল জীবন ও সৃষ্টি সম্পর্কিত অনেক কিছুই পাওয়ার আছে।

একটা দৈনিক কাগজে সাংবাদিকতা ক'রে জীবন ধারণ ক'রতে হয় এবং অনেক অসুবিধার ও সমস্যার মধ্যে জীবন যাপন করতে হয় বলে ইচ্ছা থাকলে-ও অনেক কিছুই আমার পক্ষে করে ওঠা সম্ভব হয় না।

জীবনী বিষয়ক এ রকম গঠনমূলক কাজ ব্যক্তিগত পর্যায়ে করতে হ'লেও উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন হয়। এ রকম কোনো সহযোগিতা আমি এ যাবৎ কোনোখান থেকেই পাইনি।

তদুপরি আমাদের সমাজে পর্বত প্রমাণ আর একটা বড় সমস্যা-ও আছে। একটা গঠনমূলক কাজকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মানসিকতার অভাব।

নজরুল বিষয়ক কাজ-কর্ম-ও অনেক ক্ষেত্রেই দলীয়, গোষ্ঠীগত এবং আঞ্চলিক অনুদারতার শিকার হচ্ছে।

আর একটা সমস্যা কাজ বোঝার সমস্যা। একটা বিষয়ে প্রয়োজনীয় কাজগুলো কী কী এবং জরুরী ও অপরিহার্য কাজগুলো কী কী সেটা শনাক্ত করার জন্য এবং সে বিষয়ে আবেগ পোষণ করার জন্য সে বিষয়ে এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক পড়াশুনা থাকা দরকার। তা না হ'লে আসল কাজ এবং মেকী এবং অপ্রয়োজনীয় কাজের মধ্যে পার্থক্য বোঝা যাবে না। সেটা না হ'লে অপ্রয়োজনীয় কাজগুলোর কাছে জরুরী ও অপরিহার্য কাজগুলোর মার খেয়ে যাওয়ার-ও একটা সম্ভাবনা থাকে।

www.pathagar.com

নজরুল একাডেমীর নতুন নির্বাহী পরিষদ যখন গঠিত হয় তখন এর সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে আমাকে গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদকের দায়িত্বভার দিয়েছিলেন।

নজরুল বিষয়ক কাজ-কর্ম কী হওয়া উচিত এবং কী হওয়া উচিত নয়, এ বিষয়ে যখন কথা বলি তখন এ বিষয়ে একটা দায়িত্বভার দিলে তা এড়িয়ে যাওয়া চলে না।

সে দায়িত্ব যতদিন সততা, বিশ্বস্ততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার সুযোগ থাকবে ততদিন সে দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা আমি করবো। সেই প্রেক্ষিতে গ্রন্থ প্রকাশের জন্য গ্রন্থ প্রকাশ আমরা করবো না। আমরা খুব প্রয়োজনীয় বই-ই কেবল প্রকাশ করতে চাইবো। বছরে অন্যূন যে চারটি গ্রন্থ প্রকাশের সিদ্ধান্ত হ'য়েছে সেখানে প্রকাশিত বইয়ের কোনো সংস্করণ প্রকাশের বা পুনর্মুদ্রণের ব্যাপারটি থাকবে না। সিদ্ধান্ত হ'য়েছে, নজরুল একাডেমী ষাটশতাংশ টাকা গবেষণা ও প্রকাশনা খাতে ব্যয় করবে।

২৯ বর্ষ: ২৯ সংখ্যা নজরুল একাডেমী পত্রিকার মতো এই গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সভাপতি জনাব খোন্দকার শাহাদাৎ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক জনাব মিন্টু রহমান এবং কোষাধ্যক্ষ জনাব মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন খানের উৎসাহ, উদ্যোগ কাজ করছে। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নজরুল একাডেমী কর্তৃপক্ষ বলতে কার্যত এঁদেরকেই বোঝায়।

গত ৩ জুলাই ১৯৯৮ তারিখ শুক্রবার বিকেলে গবেষণা ও প্রকাশনা সাব-কমিটির মিটিঙে সিদ্ধান্ত হ'য়েছে যে, নজরুল একাডেমীর গ্রন্থ এবং পত্রিকা ঢাকার মৌসুমী প্রিন্টার্স থেকে ছাপা হবে। ৩১ জুলাই ১৯৯৮ তারিখ শুক্রবার বিকেলে অনুষ্ঠিত নির্বাহী পরিষদের সভায় এই সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হ'য়েছে। আশা করি এর পর থেকে প্রকাশনা নিয়মিত হতে পারবে।

মৌসুমী প্রিন্টার্সের মালিক শেখ কামরুল হাসান সাহেব একজন নজরুল ভক্ত মানুষ হিসাবে প্রকাশনার ব্যাপারে কেবল মুদ্রণ সংক্রান্ত বিষয়ে নয়, এতদ্‌সংক্রান্ত আর্থিক বিষয়ে-ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই প্রেসের কম্পোজ সেকশনের জনাব তাপস শর্মা এবং জনাব আবুল কালাম আজাদের সহযোগিতাও নজরুল একাডেমী অনেক আগে থেকেই পেয়ে আসছে।

নজরুল একাডেমীর এই গ্রন্থের -ও প্রকাশনার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় আছেন অফিস সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ রফিকুল আলম খন্দকার।

www.pathagar.com

এ বছরই চারটি গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আর কোনো পাণ্ডুলিপি ইতোমধ্যে না পাওয়ার কারণে আমার এই পাণ্ডুলিপিটিই ছাপার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এই গ্রন্থে নজরুলের পারিবারিক জীবনের অনেক দুষ্প্রাপ্য তথ্যের সাথে কবি পরিবারের সে সময়কার অনেকগুলো ঠিকানা-ও এক সাথে থাকছে। এই সঙ্গে থাকছে অনেক দিক দিয়ে আমার স্ত্রী আক্তারা বানুর অনেক পরিশ্রম ও উদ্যোগ। নজরুল একাডেমী কর্তৃপক্ষের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা তো থাকছেই।

গ্রন্থটি নজরুল-সুহৃদ মুজফ্‌ফর আহমদের নামে উৎসর্গ করার চিন্তা প্রথমে আমার পত্নী আক্তারা বানুই করেছিলেন। এর একটি কারণ যেমন এই যে, তিনি নজরুলের অকৃত্রিম সুহৃদ ছিলেন, তেমনি আর একটি কারণ, "কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা" শিরোনামে তিনি নজরুলের ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিকথা লিখেছেন। তাঁর এই স্মৃতিকথা সামনে রেখে আমি এক সময় নজরুল বিষয়ক কাজ-কর্মে নেমেছিলাম। মুজফ্‌ফর আহমদের এই অবদান নানান দিক দিয়ে অবিস্মরণীয়। পশ্চিম বঙ্গে নজরুল চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর আন্তরিকতা ও উদ্যোগ বিশেষভাবে কাজ করেছে।

"কবি খুব পান খেতেন আর হো হো ক'রে হাসতেন", কিংবা "মানুষটা ছিলেন আগোছালো জাত বোহীমিয়ান", এ ধরণের গাল-গল্পের স্তর থেকে বেরিয়ে এসে নজরুল চর্চা যে আজ একটা বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে করা সম্ভব হচ্ছে, তার-ভিত্তিভূমি এক সময় তিনিই রচনা করেছিলেন।

৬ আগস্ট ১৯৯৮

শেখ দরবার আলম
সম্পাদক
গবেষণা ও প্রকাশনা

www.pathagar.com

সূচী

নজরুল জীবন ৩
কবির পালিত কন্যার স্মৃতিকথা ১৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কবি কাজী নজরুল ইসলাম

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নজরুল জীবন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নজরুল জীবন

পালিত কন্যা শান্তিলতা দেবীর স্মৃতিকথায় নজরুল জীবনের কথাই আছে, বিশেষত তাঁর পারিবারিক জীবনের কথা।

নজরুল জীবন ও সৃষ্টি অত্যন্ত বিশাল, ব্যাপক এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। এর একটি তারিখ-তথ্য ভিত্তিক রূপরেখা দিতে হ'লেও সেটা অন্তত পরিধির দিক দিয়ে শান্তিলতা দেবীর স্মৃতিকথাগুলোকে ছাপিয়ে যাবে। তাই সেটা এ কারণে-ও ঠিক হবে না।

এখানে নজরুল জীবন বিষয়ে যে কথাগুলো বলা যায় সেটা শান্তিলতা দেবীর স্মৃতিকথা কেন্দ্রিক হওয়াই আবশ্যক।

শান্তিলতা দেবীর স্মৃতিকথাটা মনোযোগ দিয়ে পড়লে তাতে অনেকের অনেক ভুল ধারণারই অবসান ঘটবে।

বিশেষত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা ক'রে একটা অজ্ঞতাপ্রসূত কথা অনেকেই ব'লে থাকেন যে, কবি গোছাল ছিলেন না। নিজের রচনাদি, নিজের সৃষ্টিগুলো গোছগাছ ক'রে রাখার মতো ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা তাঁর ছিল না।

তাঁর সম্পর্কে ভিত্তিহীন আর যে কথাটি বলা হয় সেটা এই যে, তিনি 'বোহীমিয়ান' ছিলেন, উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন, বেদের মতো এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। ইত্যাদি।

বোহীমিয়ান হওয়া অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খল হওয়া এবং বেদের মতো এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর অভিযোগটা আসে বিশেষত তাঁর স্কুল জীবন প্রসঙ্গে।

আমি আগে প্রথম অভিযোগটির প্রসঙ্গে আসছি।

গোছাল হওয়া প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের তুলনা চলে না মূলত অর্থনৈতিক স্তরের পার্থক্যের কারণে।

মনে রাখা দরকার, রবীন্দ্রনাথের দু'টো স্থায়ী ঠিকানা ছিল। এর একটা হলো কলকাতার জোড়াসাঁকোয় তাঁদের সুবিখ্যাত ও সুবিশাল ঠাকুর বাড়ি এবং অন্যটি হ'লো বীরভূমের শান্তিনিকেতনে বিশ্ব ভারতী।

www.pathagar.com

লক্ষ্যণীয় যে, দুটোই স্থায়ী ঠিকানা। তদুপরি রবীন্দ্রনাথের একজন উপযুক্ত সেক্রেটারী ছিলেন।

তাছাড়া রবীন্দ্র রচনাদি সংরক্ষণের নিজস্ব ব্যবস্থা আছে বিশ্বভারতীর।

কিন্তু সেক্রেটারী থাকা তো দূরের কথা, কোথাও কোনো স্থায়ী ঠিকানা ছিল না নজরুলের।

শান্তিলতা দেবীর সাক্ষাৎকারে দেখছি কবি পরিবারকে ভাড়া বাড়ি একটার পর একটা পাল্টাতে হ'য়েছে। ভাড়া পরিশোধ করা হয় নি, এই অভিযোগে কবির অসুস্থতার পর শ্যামবাজার স্ট্রীটের বাসা থেকে কবি পরিবারকে রাত এগোরোটায় জিনিষপত্র সমেত বাড়িওয়ালা ড: ডি. এল. সরকার নামিয়ে দিয়েছেন। এর পর কবি পরিবারকে একটার পর একটা এমন সব অনুপযুক্ত বাসায় থাকতে হ'য়েছে যেখানে তাঁর রচনাদি সংরক্ষণের কোনো সুযোগ থাকারই কথা নয়। তা হ'লে তো দেখা যাচ্ছে যে, সমস্যাটা অর্থনৈতিক। গোছাল বা অগোছাল হওয়ার নয়।

এর পাশাপাশি মনে রাখতে হবে, কবি নিশ্চল নিশ্চুপ হ'য়ে যাওয়ার কয়েক বছর আগে থেকে পক্ষাঘাতে নিম্নাঙ্গ অবশ হ'য়ে পড়ায় কবি পত্নী-ও হ'য়ে প'ড়েছিলেন শয্যাশায়ী। কবি অসুস্থ হ'য়ে পড়ার বছর চারেক পর ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় কবির শাশুড়ি-ও নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেলেন। তখন তাঁর জীবিত দুই সন্তান তো ছিলেন খুবই ছোট। কবির পালিত কন্যা তো ছিলেন অসচেতন ও অপরিণত মনের। অতএব, তাঁর রচনাদি সংরক্ষণের উপযুক্ত কেউ তাঁর পরিবারে ছিলেন না। তদুপরি আশ্রয় ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির ওপর নির্ভর করতে হ'য়েছে। এ রকম পরিস্থিতিতে রচনাদি সংরক্ষণ সুষ্ঠুভাবে হওয়ার নয়।

এ তো গেলো গোছগাছ করে রাখার বা অগোছাল হওয়ার প্রসঙ্গে।

এরপর আসছি, তাঁর একটার পর একটা স্কুল পাল্টানো প্রসঙ্গে।

এটার কারণ-ও যে অর্থনৈতিক সেটা মুজফ্ফর আহ্মদ তাঁর "কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা"য় স্পষ্টতই লিখেছেন।

বিষয়টি আসলে নির্ভর ক'রেছে, পড়াশুনার সুযোগ কবি কোথায় কতদিন পেয়েছেন, তার ওপর।

তাঁর জন্ম ১৩০৬-এর ১১ জ্যৈষ্ঠ (১৮৯৯'-র ২৪মে) বুধবার বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার তৎকালীন রাণীগঞ্জ থানার অন্তর্গত ঐতিহাসিক চুরুলিয়া গ্রামের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ কাজী পরিবারে।

www.pathagar.com

আব্বা কাজী ফকির আহ্‌মদ, আম্মা জাহেদা খাতুন, বড় ভাই কাজী সাহেব জান, ছোট ভাই কাজী আলি হোসেন, এবং সবার ছোট তাদের বোন উম্মে কুলসুম। পিতা কাজী ফকির আহ্‌মদের প্রথমা পত্নীর একমাত্র সন্তান মোসাম্মাৎ সাজেদা খাতুন-ও তখন এই সঙ্গে একই পরিবারে ছিলেন।

পরিবারে সব চেয়ে বড় বিপর্যয় দেখা দিলো, যখন ২০ মার্চ ১৯০৮ : ১৬ শফর ১৩২৬ : ৭ চৈত্র ১৩১৪ তারিখ শুক্রবার কবির আব্বা কাজী ফকির আহ্‌মদ ইন্তেকাল করলেন।

১৯০১ থেকে ১৯১১ পর্য্যন্ত এতদঞ্চলে কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল।

কবির আব্বা যখন ইন্তেকাল করেন, কবি তখন চুরুলিয়ার মক্তবে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র।

চতুর্থ শ্রেণী থেকে উত্তীর্ণ হ'য়ে জীবিকার প্রয়োজনে ১৯০৯-এর জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর, এই শিক্ষা-বর্ষে কবি মক্তবে শিক্ষকতা করেন।

পিতার ইন্তেকালের পর এ সময় তিনি মসজিদে ইমামতি এবং গ্রামে গ্রামে মিলাদ মাহফিল-ও করেছেন। পীর হাজী পাহ্‌লোয়ানের মাজার শরীফে খাদেম-ও ছিলেন তিনি।

তাঁর আব্বার চাচাতো ভাই কাজী বজল-ই-করীমের কাছে বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্য চর্চা এবং বাঙ্‌লায় ছড়া ও কবিতা লেখার তালিমও এ সময় থেকেই নিয়েছিলেন নজরুল। পাঠ নিয়েছেন আরবী, ফার্সী, উর্দু ও বাঙ্‌লায়।

ইতোমধ্যে পারিবারিক দারিদ্র্যের কারণে কাজী নজরুল ইসলামের বড় ভাই কাজী সাহেবজান অতি অল্প বেতনে রাণীগঞ্জের কয়লাখনিতে চাকরী নিতে বাধ্য হন।

জীবিকার প্রয়োজনে আসানসোলের এম. বখ্‌শের রুটির দোকানে চাকরি নিতে বাধ্য হ'লেন নজরুল।

১৯১১ থেকে ১৯২১ সাল, এই দশ বছর একমাত্র আসানসোল মহকুমা ব্যতীত বর্ধমান জেলার অন্যান্য সব এলাকায় কতিপয় নদীর বন্যা এবং কলেরা, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ম্যালেরিয়া মহামারীতে জন সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হ্রাস পায়।

১৯১১-'র জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর, এই শিক্ষাবর্ষে আসানসোল শহরের তদানীন্তন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর কাজী রফিকুল্লাহ্‌ ও তাঁর পত্নী শামসুন্নেসা খানমের আশ্রয়ে ময়মনসিংহের কাজীর সিমলা দরিরামপুর হাই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ছিলেন নজরুল। বিভিন্ন বাড়ীতে জায়গীর থেকে ছাত্র পড়িয়ে পড়াশুনা করতেন তিনি।

www.pathagar.com

১৯১২-'র জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর, এই শিক্ষাবর্ষে তিনি বর্ধমানে মাথরুণ নবীনচন্দ্র ইন্সটিটিউশনে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক তখন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক।

১৯১৩ সালে বর্ধমান জেলার পূর্বাঞ্চলীয় মহকুমাগুলো দামোদর, অজয়, খেরী, কুমার এবং ভাগীরথীসহ কতিপয় নদীর বন্যার কবলে পড়ে। এবং এই সব বন্যাকবলিত এলাকায় তখন কলেরা ও ম্যালেরিয়া মহামারী আকারে দেখা দেয়। ১৯১৩'-র জুলাই-আগস্ট থেকেই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-ও মহামারীর আকার নেয়। এই মসিবতের কয়েক মাস পর কিশোর নজরুল ১৯১৪-'র জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর এই শিক্ষাবর্ষে বর্ধমান শহরে অ্যালবার্ট ভিক্টর ইন্সটিটিউশন (নিউ স্কুল)-এ অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। থাকতেন বর্ধমান শহরে পুরোনো চকে মুসলমান এলাকায়। অ্যালবার্ট ভিক্টর ইন্সটিটিউশনে নজরুল যে সে সময় প্রখ্যাত সাহিত্য ঐতিহাসিক ও সমালোচক ডক্টর সুকুমার সেনের সহপাঠী ছিলেন সে তথ্য পশ্চিম বঙ্গ থেকে ১৩৮৩-'র "সাম্পান" : প্রথম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা'য় প্রকাশিত হ'য়েছে। ডক্টর সুকুমার সেন ব'লেছেন যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইসচ্যান্সেলর দেব প্রসাদ সর্বাধিকারী স্বয়ং ইন্সপেকশন ক'রে ১৯১৫ সালে অনুমোদন প্রত্যাহার ক'রে নিলে স্কুলটি উঠে যায়।

১ আগস্ট ১৯১৪'-য় রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানী যুদ্ধ ঘোষণা করলো।

জার্মানীর বিরুদ্ধে বৃটেন যুদ্ধ ঘোষণা করলো ৪ আগস্ট ১৯১৪-য়।

১৯১৫'-র জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর, এই শিক্ষাবর্ষে নজরুল রাণীগঞ্জ শিয়ারসোল রাজ হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। শিক্ষাবর্ষ ১৯১৬'-য় সেখানে তিনি ছিলেন দশম শ্রেণীর ছাত্র।

দামোদর এবং অজয় আবারো বন্যা চাপিয়ে দেয় ১৯১৬-১৭, ১৯১৭-১৮, এবং ১৯১৮-১৯-এ। এ সব বছর গুলোতে-ও বন্যাজনিত কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। নজরুল যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র সে সময় ১ সেপ্টেম্বর ১৯১৬ তারিখ শুক্রবার বর্ধমান টাউন হল-এ বেঙ্গলী ডবল কোম্পানীতে ভর্তির আহ্বান জানিয়ে সভা হয়। সেনা বাহিনীতে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে নজরুল সাড়া দিলেন বৃটিশ বিতাড়নের লক্ষ্যে রণ-কৌশল আয়ত্ত করার বাসনায় শুধু নয়, আর্থিক অনটনের তাড়নায়-ও বটে।

নজরুল জীবনের কৈশোরের এই যে রূপরেখা, এই যে ছবি, এর মধ্যে পড়াশুনা করার এবং জীবন ধারণের আর নিজ পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা করার সুযোগ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছুটে চলার তাগিদ

www.pathagar.com

আছে। বোহীমিয়ান হওয়ার, উচ্ছৃঙ্খল হওয়ার এবং বেদেদের মতো ঘুরে বেড়ানোর মানসিকতা নেই।

একজন মানুষের সমস্যাটাকে নথি-তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ ক'রে সূক্ষ্মভাবে খতিয়ে দেখতে না চেয়ে সেটাকে বিলাসিতা বলাটা নিশ্চয়ই অত্যন্ত অবিবেচনাপ্রসূত কাজ!

জীবন ও জীবিকাই তাঁকে এক ঠিকানা থেকে আর এক ঠিকানায় পৌঁছে দিয়েছে।

মাতৃসমা মিসেস এম. রহমানের উদ্যোগে আশালতা সেনগুপ্তার সঙ্গে কবি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হ'য়েছিলেন ২৫ এপ্রিল ১৯২৪ তারিখ মঙ্গলবার কলকাতার ৬ নম্বর হাজী লেনের বাসায়।

কবির প্রথম পুত্র আজাদ কামাল (কৃষ্ণ মুহম্মদ)-এর জন্ম হয় ১১ আগষ্ট ১৯২৫ (২৬শ্রাবণ ১৩৩২) তারিখ মঙ্গলবার হুগলীর চকবাজারের "রোজ ভিলা-"র একাংশে থাকতে।

৯ অক্টোবর ১৯২৬ তারিখ শনিবার কবির দ্বিতীয় পুত্র অরিন্দম খালিদ ওরফে বুলবুলের জন্ম হ'য়েছে আর এক ঠিকানায় কৃষ্ণনগরে চাঁদ সড়কে গ্রেস কটেজে।

কৃষ্ণনগরের এই গ্রেস কটেজেই বুলবুলের জন্মের দু'-আড়াই বছর পর কবি পত্নীর আত্মীয়া হিসাবে বেড়াতে আসেন এবং কবির পালিত কন্যা হিসাবে থাকতে শুরু করেন শান্তিলতা সেনগুপ্তা। বুলবুলের জন্মের দু'-আড়াই বছর পর থাকতে আসার কথা ব'লেছেন শান্তিলতা দেবী। এটা শান্তিলতা সেনগুপ্তার দেওয়া একটা ভুল হিসাব। কেননা, বুলবুলের জন্মের বছর দেড়েক পর কৃষ্ণনগর চাঁদ সড়কের গ্রেস কটেজের বাসা ছেড়ে ছিলেন কবি। ১৯২৮-এর ৯ এপ্রিল সোমবার কৃষ্ণ নগরের বাসা ছেড়ে কবি সপরিবারে কলকাতা আসেন।

অতএব শান্তিলতা দেবী কৃষ্ণনগরে চাঁদ সড়কে গ্রেস কটেজে কবি পরিবারে আসেন ১৯২৮-এর ৯ এপ্রিলের আগে।

২৮ মে ১৯২৮ : ৮ জেলহজ্জ ১৩৪৬ : ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ তারিখ সোমবার কবির আম্মা জাহেদা খাতুন প্রায় ৫৫ বছর বয়সে যখন চুরুলিয়ায় ইন্তেকাল করেন তখন কবি পরিবার থাকতেন কলকাতার ১১ ওয়েলেস্‌লি স্ট্রীটের ঠিকানায়।

কবির তৃতীয় পুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলামের জন্ম হয় ৯ অক্টোবর ১৯২৯ (২৩ আশ্বিন ১৩৩৬) তারিখ বুধবার কলকাতার ৮/১ পান বাগান লেনের ঠিকানায়।

বসন্ত রোগে কবির দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যু হয় ২৪ বৈশাখ ১৩৩৭ (৭ জেল্কদ ১৩৪৮) : ৭ মে ১৯৩০ তারিখ বুধবার কলকাতার ৫০/২, এ, মসজিদ বাড়ী স্ট্রীটের ঠিকানায়।

www.pathagar.com

কবির চতুর্থ পুত্র কাজী অনিরুদ্ধ ইসলামের জন্ম হয় ২৪ ডিসেম্বর ১৯৩১ (৮ পৌষ ১৩৩৮) তারিখে কলকাতার ৩৯, সীতানাথ রোডের ঠিকানায়।

কলকাতার ১৫/৪, শ্যামবাজার স্ট্রীটের বাসায় থাকতে ৯ অক্টোবর ১৯২৪ (২৭ রমজান ১৩৬১) : ২২ আশ্বিন ১৩৪৯ তারিখ শুক্রবার মহালয়ার দিন কবি প্রথম ভুল বকতে শুরু করেন।

ফ্ল্যাট নং ৪, ব্লক 'এল', সি. আই. টি. বিল্ডিং, ৪/২ ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা ১৭, এই ঠিকানায় থাকতে ১৫ আষাঢ় ১৩৬৯ (২৭ মোহররম ১৩৮২) : ৩০ জুন ১৯৬২ তারিখ শনিবার কবি-পত্নী প্রমীলা নজরুল ইসলাম পরলোকগমন করেন। কবির জীবিত দুই ছেলে তখন থাকেন কলকাতার দুই ঠিকানায়।

২৪ মে ১৯৭২ (১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯) তারিখ বুধবার কবিকে ঢাকায় আনা হয়। এ দিন থেকে কবি থাকেন ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় পুরোনো ২৮ নম্বর রোডের ৩৩০ বি নম্বর বাড়ি, ঢাকা ১২০৯, এই ঠিকানায়।

কবি-সুহৃদ মুজফ্ফর আহ্মদ ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৩ (২ পৌষ ১৩৮০) তা[illegible] মঙ্গলবার ভোর পাঁচটায়।

এরই মাস দুই পর ১৯৭৪-এর ২২ ফেব্রুয়ারী (১৩৮০-'র ১০ ফাল্গুন) শুক্রবার কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম ইন্তেকাল করলেন। তাঁর দুই ছেলে এবং এক মেয়ে যথাক্রমে অনির্বাণ কাজী, অরিন্দম কাজী এবং অনিন্দিতা কাজী। পত্নী: কল্যাণী কাজী।

২৩ জুলাই ১৯৭৫ (৬ শ্রাবণ ১৩৮২) তারিখ বুধবার সকালে কবিকে ঢাকার পি. জি. হাসপাতালে ১১৭ নম্বর কেবিনে স্থানান্তরিত করা হয়।

২৯ আগস্ট ১৯৭৬ (১২ ভাদ্র ১৩৮৩ :২ রমজান ১৩৯৬) তারিখ রবিবার বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টা বেজে ১০ মিনিট (ভারতীয় সময় সকাল ৯টা বেজে ৪০ মিনিটে) পি জি হাসপাতালের এই ১১৭ নম্বর কেবিনে কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এ দিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে কবিকে সমাহিত করা হয়। কবি-পত্নীকে সমাহিত করা হ'য়েছিল কবির স্বগ্রাম চুরুলিয়ায়।

২ মার্চ ১৯৭৯ (১৭ ফাল্গুন ১৩৮৫ : ৩ রবিয়স্‌সানি ১৩৯৯) তারিখ শুক্রবার কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে কবির তৃতীয় সন্তান কাজী সব্যসাচী ইসলাম ইন্তেকাল করেন। তাঁর দুই মেয়ে এবং এক ছেলে যথাক্রমে খিলখিল কাজী, মিষ্টি কাজী এবং বাবুল কাজী। পত্নী : উমা কাজী।

www.pathagar.com

নজরুল পালিত কন্যা শান্তিলতা দেবী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কবির পালিত কন্যার স্মৃতিকথা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কবির পালিত কন্যার স্মৃতিকথা

কবি কাজী নজরুল ইসলামের পালিত কন্যা শান্তিলতা দাশগুপ্তার নামটুকু পর্যন্ত কোনো নজরুল-জীবনী কেন, কোনো নজরুল স্মৃতিকথায়-ও এ যাবৎ চোখে পড়েনি। তাঁর কথা আমি প্রথম শুনেছিলাম কবির পুত্রবধূ উমা কাজীর কাছে, কবি- পৌত্রী খিলখিল কাজীর কাছে। কবি-জীবন প্রসঙ্গে কথা উঠলে ওঁরা প্রায়ই বলতেন, "উনি আসবেন। ওঁর কাছ থেকে আপনি অনেক কিছুই জানতে পারবেন।"

তারপর এক সময় তিনি এলেন। ১৯৮৭ সালের মে মাসের ২৬ তারিখ (১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪) মঙ্গলবার কবির জন্মদিনে প্রত্যূষে কবির মাজারে গেছি জিয়ারত করতে। দেখলাম খিলখিল, মিষ্টি, বাবুল বসে আছে। ওদের সঙ্গেই আছেন এক প্রৌঢ়া মহিলা। আমি অনুমান করছিলাম। খিলখিল পরিচয় করিয়ে দিলো: "ইনিই শান্তিলতা দেবী', যাঁর কথা আপনাকে বলেছিলাম। কবির পালিতা কন্যা, যাঁর আসার কথা ছিল।"

সেই প্রত্যূষে কবির মাজার প্রাঙ্গণে খিলখিল-মিষ্টি দ্বৈতকণ্ঠে গান গাইল: 'কেমনে হইব পার?'

কবির কথা, তাঁর পরিবারের কথা, কী ছিলো, কী হয়েছিলো, সে সব কথা চিন্তা করে চোখ দুটো ভিজে গিয়েছিলো। সবার চোখের আড়ালে চোখ মোছার চেষ্টা করলাম।

খিলখিল বললে: "আজ দাদুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বাড়ীতে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। আসবেন।"

নজরুল একাডেমীর অনুষ্ঠানের কাজ সেরে রওয়ানা হতে খানিকটা রাত হয়ে গেলো। সঙ্গে একাডেমীর ছাত্রী – সীমা রাজ্জাক এবং আর একটি মেয়ে। ওরাও যাবে খিলখিলদের বাড়ী। সীমার আর একটা পরিচয় এই যে, সে খিলখিলদের স্থানীয় অভিভাবক আশরাফ সাহেবের মেয়ে। এখানে পৌঁছে দেখি ওঁদের আত্মীয় কাজী আবু জাফর সিদ্দিকীর পরিচালনায় অনুষ্ঠান হচ্ছে। কবির পালিত কন্যা সেখানেই বসে।

অনেকের মতো আমাকে-ও কিছু বলতে হলো। ফাতেমা-তুজ্-জোহরা

www.pathagar.com

বললেন: "আমার গান না শুনে যেতে পারবেন না।" তাঁর গান যখন শেষ হলো তখন রাত এগারোটা বেজে গেছে। এর পর সাক্ষাৎকার নেওয়া কেন, বিস্তারিত আলাপ করার-ও সুযোগ থাকার কথা নয়। তবু খিলখিলের মধ্যস্থতায় তারিখ এবং সময় নির্ধারিত হলো। এর দু'দিন পর বেলা দশটায়।

কথা হ'লো : ওই সময় তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে যাবো।

উঁনি থাকবেন।

কিন্তু নির্ধারিত সময়ে সেদিন গিয়ে শুনি: বজবজ ফেরার আগে তিনি বাজার করার ব্যাপারে খুবই ব্যস্ত। তবু সাক্ষাৎকার তিনি দিলেন। এই ব্যস্ততা এবং অস্বস্তির মধ্যে তাঁর বিস্তারিত পরিচয়-ও আমি তখনই পেলাম। তাঁর সেই বেজায় ব্যস্ততার মধ্যেই। এই অস্বস্তির মধ্যে-ও তাঁর সেই মহার্ঘ্য পরিচয়টা শান্তিই দিলো।

শান্তিলতা সেনগুপ্তা হলেন কবি পত্নী পরলোকগতা আশালতা সেনগুপ্তার দূর সম্পর্কের আত্মীয়া। তিনি খোকা ওরফে বিজয় সেনগুপ্তের সহোদরা। কবি অসুস্থ হয়ে পড়ার সময় এই যুবক-ও আশৈশব কবি পরিবারে থাকতেন। কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের লেখা "কাজী নজরুল ইসলাম: :স্মৃতিকথা"-য় এঁর কথা আছে।

শান্তিলতা সেনগুপ্তা ও তাঁর ভাই বিজয় সেনগুপ্তের বাবার নাম নিবারণ সেনগুপ্ত। মা সুশীলা দেবী। এঁদের মা বজবজের একটি প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। কবি অসুস্থ হয়ে পড়ার বেশ কিছু দিন পর শান্তিলতা দাশগুপ্তা এই স্কুলেই তাঁর মায়ের জায়গায় শিক্ষকতা করতে যান। তাঁর মায়ের স্থলাভিষিক্ত হন। দীর্ঘদিন চাকরী করার পর শিক্ষাগতযোগ্যতার অনটনের অজুহাতে একটা সময় তিনি চাকরি থেকে উৎখাত হয়েছেন, মামলা মোকদ্দমা করেছেন, ইত্যাদি।

কিন্তু এখন তাঁর শিক্ষকতার চাকরী না থাকলে-ও তিনি বজবজেই থাকেন। শান্তিলতা দাশগুপ্তার এখনকার ঠিকানা : দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার শ্যামপুর এলাকায় নারকেলডাঙ্গা গ্রামে। এখানকার পোষ্ট অফিস বজবজ। কলকাতার এসপ্লানেডে ধর্মতলায় গিয়ে ৭৭ কিংবা ৭৭-এ বাসে উঠে শ্যামপুর স্টপেজে নেমে বজবজের কয়লা সড়কে ডেন্টিস্ট মৃণাল সেনের বাড়ীর কাছে যেতে হবে। মৃণাল সেনের বাড়ীর পাশেই শান্তিলতা দেবীর বাড়ী।

জায়গাটায় নজরুল জীবনীকারদের যাওয়ার অনেক দরকার ছিল। বুঝতে পারি, সেখান থেকে অর্থাৎ তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু পাওয়ার ছিল।

শান্তিলতা সেনগুপ্তার মায়ের বাপের বাড়ী ফরিদপুরে। বিধবা মায়ের সঙ্গে ছ'-সাত বছর বয়সে তিনি কবি পরিবারে বেড়াতে এসেছিলেন। সেই থেকেই থেকে যান।

www.pathagar.com

তাঁর মাকে কবিই নাকি রেখে যেতে বলেছিলেন। কবির পারিবারিক জীবন বিষয়ে এ সবই অত্যন্ত গভীরভাবে ভেবে দেখার মতো।

পালিত কন্যা হিসাবে কবি পরিবারে তিনি কখন এসেছিলেন, এ প্রশ্নের জবাবে শান্তিলতা দেবী বললেন, "বুলবুল যখন দু' বছর আড়াই বছরের তখন আমি আসি।" তার মানে ১৯২৭-২৮ এর দিকে?

কবির দ্বিতীয় সন্তান বুলবুলের জন্ম ৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ (২৩ ভাদ্র ১৩৩৩ : ৩০ সফর ১৩৪৫) তারিখ বৃহস্পতিবার কৃষ্ণনগরে চাঁদ সড়কে গ্রেস কটেজে। এর বছর দু'-আড়াই পর শান্তিলতা সেনগুপ্তা তাঁর মায়ের সঙ্গে কবি পরিবারে বেড়াতে আসেন এবং পালিত কন্যা হিসাবে থাকেন। কবি পরিবার তখন-ও কৃষ্ণনগরের চাঁদ সড়কে গ্রেস কটেজেই থাকতেন।

শান্তিলতা দেবীর সাক্ষাৎকার ক্যাসেটে রেখাবদ্ধ করতে আমি 'টিডিকে ৯০' দু'টো টেপ ব্যবহার করেছি।

আমি শান্তিলতা দেবীকে কবির প্রথম সন্তান আজাদ কামাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বল্‌লেন : "কবির প্রথম সন্তান সাত মাসে মারা যায়। চুঁচুড়ার বাড়ীতে হয়েছিলো।"

কবির প্রথম সন্তানের আকিকার সময় (অন্ন প্রাশনে) কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র চুঁচুড়াতে গিয়েছিলেন। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র আমাকে বলেছিলেন : 'দেখে তখনই মনে হয়েছিলো বাঁচবে না।'

কৃষ্ণনগরে চাঁদ সড়কের গ্রেস কটেজে তিনি পালিতা কন্যা হিসাবে যখন আসেন তখন সেখানে চাকর-বাকর কেউ ছিলো কি না, এ প্রশ্নের জবাবে শান্তিলতা দেবী বললেন: "গ্রেস কটেজে দু'-চার জন আয়া ছিলেন বদলি হয়ে হয়ে। এরা সবাই কৃষ্ণনগরের।" অতএব, কবি পরিবারের সঙ্গে যে আয়ার ছবি আমরা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের "কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতি কথা"-য় দেখি, তিনি কৃষ্ণনাগরিক।

কবি পরিবারে শান্তিলতা দেবী দীর্ঘদিন ছিলেন। তাঁর বিয়ের পর-ও ছিলেন। শ্বশুর বাড়ীতে থেকেছেন মাঝে মাঝে এবং মাত্র অল্প কিছু দিন। কবির অসুস্থতার পর-ও তিনি বহুদিন যাবত কবি পরিবারে ছিলেন। কৃষ্ণনগরের চাঁদ সড়কে গ্রেস কটেজে এবং এরপর কবি আর যেসব বাসায় ছিলেন, সে সবখানেই তিনি কবি পরিবারের সঙ্গে ছিলেন বল্‌লেন। যে বাসাগুলোয় তিনি ছিলেন বল্‌ছেন সে বাসাগুলোর এলাকা হলো মসজিদ বাড়ী স্ট্রীট, সতীনাথ রোড, গ্রে স্ট্রীট, শ্যামবাজার স্ট্রীট, বাদুড় বাগান, মানিকতলা এবং মন্মথ দত্ত রোড। পান বাগান লেনের কথা তিনি বলেন নি। এর অর্থ এই সময়টা তিনি শ্বশুর বাড়ী ছিলেন। মাঝখানে একটা স্বল্প বিরতি মাত্র। কবির

www.pathagar.com

পারিবারিক জীবন বিষয়ে এই ব্যাপারটা-ও ভেবে দেখার মতো। ভাবতে কেমন লাগে!

শান্তিলতা দেবীর স্মৃতি কথায় কবির সব ঠিকানার কথা আসেনি। পুরো ঠিকানা আসে নি। কবির অবদান সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন না থাকার কারণেই এমনটা হ'য়েছে। কবি পরিবারে তিনি যে ছিলেন এর পেছনে তাঁর প্রতি কবির স্নেহের দিক এবং কবি পরিবারের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার দিকটি যেমন ছিল, তেমনি ছিল তাঁর বাপের বাড়ীর অর্থনৈতিক অনটনের দিকটি-ও।

শান্তিলতা সেনগুপ্তা বিয়ের পর থেকে শান্তিলতা দাশগুপ্তা হলেন। তাঁর পৈতৃক পদবী আর কবির শ্বশুরকুলের পদবী এক। শান্তিলতা দেবীর পদবীর পরিবর্তন হয়েছিলো তাঁর বিয়ের পর। সেনগুপ্ত থেকে দাশগুপ্ত। শান্তিলতা দেবীর ভাই বিজয় সেনগুপ্ত-ও কবি পরিবারে থাকতেন। কবির অসুস্থতার পর এক সময় তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটে। বিজয় সেনগুপ্তকে কবি খোকা বলে ডাকতেন। আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে এই নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন। আর শান্তিলতা দেবী নিজের সম্পর্কে বলেছেন, "কবি আমাকে খুকু বলে ডাকতেন।"

একটা কন্যা সন্তানের আকাঙ্খা ছিল কবির। তাই শান্তিলতা সেনগুপ্তার ব্যাপারটা না হয় একভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু খোকা অর্থাৎ বিজয় সেনগুপ্তের ব্যাপারটা?

শান্তিলতা দেবীর কাছে কবির, কবি পত্নীর এবং কবির পারিবারিক জীবনের এমন অনেক খবর পাওয়া যায় যেগুলো এ যাবত কোনো নজরুল স্মৃতিকথায় কিংবা নজরুল জীবনীমূলক কোনো লেখায় আসেনি।

কিন্তু এই কথাগুলো, এই বিবরণগুলো, এই তথ্যগুলো নজরুল জীবনীতে আসা দরকার।

কবির পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জানতে চাইলে, তিনি খুব সহজভাবে বল্‌লেন, "নিজ পরিবারের কাছে কবি খুব শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কখনো চীৎকার করে কথা বলতেন না।"

অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, ব্যবহারিক জীবনে ব্যক্তিত্ববান, ঋজু প্রকৃতির এই মানুষটার ঔদার্য্যের, মহত্ত্বের এ-ও এক দিক বটে!

কবির একটা অদ্ভুত অভ্যাসের কথা তিনি বললেন। নিয়মিত সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি বাথ্‌রুমে চলে যেতেন খবরের কাগজ হাতে নিয়ে। খবরের কাগজটা তিনি বাথ্‌রুমে বসেই পড়তেন। ব্যস্ত কবি কাগজ পড়ার জন্য সম্ভবত ব্যয় করতে পারতেন এই একটা সময়ই। বাসায় যে দু'-তিনটে খবরের কাগজ নেওয়া হতো

www.pathagar.com

সেগুলো হ'লো "আনন্দবাজার পত্রিকা", "যুগান্তর",এবং "দি স্টেটস্‌ম্যান"। "আনন্দবাজার পত্রিকা" এবং "স্টেটস্‌ম্যান" সব সময়ই থাকতো। কবি পড়তেন 'স্টেটস্‌ম্যান'। বাংলা কাগজ নেওয়া হতো মূলত বাড়ীর মহিলাদের জন্য। কবি যে রোজ সকালে কেবল ইংরেজী দৈনিক 'স্টেটস্‌ম্যান' পড়তেন, কিংবা বলা চ'লে মূলত ইংরেজী দৈনিক পড়তেন, তাঁর রুচি, শিক্ষাদীক্ষা এবং দৃষ্টিভঙ্গিটা জানার ব্যাপারে এটা-ও একটা লক্ষণীয় খবর বটে।

কবির আর একটা মজার অভ্যাস ছিলো প্রতি রাতে তাস খেলা। বাসায় ফিরতে তাঁর যতই রাত হোক না কেন, ঘুমাতে যাওয়ার আগে প্রতি রাতে তিনি তাস খেল্‌তেন। তাস খেলতেন তিনি রাত দু'টো, আড়াইটে, তিনটে পর্যন্ত। কখনো কখনো রাত চারটে পর্যন্ত-ও তাস খেলতেন। ভাবা যায়? তাঁর বিপুল, ব্যস্ত কর্মময় জীবনে তাস খেলার জন্য এই তাগিদ ছিল কেন? যে মানুষটা সকালে উঠে নিয়মিত অফিসে যেতেন তিনি ঘুমাতেন কতক্ষণ?

শান্তিলতা দেবীকে আমি প্রশ্ন করলাম : "প্রতি রাতে এই তাস খেলায় তাঁর সঙ্গী হতেন কারা?" রাতে নিয়মিত তাঁর খেলার সঙ্গী হওয়ার মতো কারা বাড়িতে থাকতেন জানতে চেয়েছিলাম।

জবাবে তিনি ব'ললেন, "কবির শাশুড়ী, আমি ও তাঁর স্ত্রী।"

"আমাকে তিনি তাস খেলা শিখিয়ে নিয়েছিলেন।"

শান্তিলতা দেবী জানালেন, "এই তাস খেলার সঙ্গী হিসাবে ক্বচিৎ কখনো বাইরের কেউ থাকতেন।" কবির পারিবারিক জীবনের একটা ছবি-ও এখানে রয়েছে। তাঁর পরিবারের মানুষ জনদের প্রতি একটা মমত্ববোধ, তাঁদেরকে একটা সঙ্গ দেওয়ার, সময় দেওয়ার গরজ তাঁর চিন্তায়, চেতনায় এবং পরিকল্পনায় ছিল।

অনেক রাতে বাড়ী ফেরার পর-ও তাস খেলার এই নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যাস কবি পরিবারকে সান্নিধ্য দেওয়া, না রাতের এই সময়টিতে নিঃসঙ্গতা থেকে নিস্তার লাভের প্রয়াস, না নিছক আনন্দলাভ? এসব প্রশ্ন কখনো কবি পরিবারে কারো মনে দেখা দিয়েছিলো কি না সে খবর শান্তিলতা দেবী আমাকে জানাননি। এত গভীরে উপলব্ধি ক্ষমতা সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় সে দিনকার আট বছর বয়সের শান্তিলতার ছিলো বা এখনকার শান্তিলতা দেবীর আছে বলে-ও আমার মনে হয়নি। তাঁর সম্পর্কে আমার কেবল এইটুকু মনে হয়েছে যে, এক চরম দারিদ্র্য থেকে, অসহায় অবস্থা থেকে তিনি কবি পরিবারে ঠাঁই পেয়েছিলেন। কবি তাঁর রোজগারের সমস্ত টাকা এনে সংসারকে দিয়েছেন। সেখানে এক অসহায় আত্মীয়াকে মেয়ের মতো মনে ক'রে আশ্রয় দিয়েছেন। আর শান্তিলতা সেনগুপ্তা আশ্রয় লাভ ক'রে নিজে ভাল

www.pathagar.com

থেকেছেন। যিনি এই ভাল থাকার ব্যবস্থাটা ক'রে দিয়েছেন তাঁকে গভীরভাবে বুঝবার কোনো চেষ্টা তাঁরা করেন নি। কবি তাঁর টাকা এনে দিয়েছেন। ওঁরা খুশী মনে সে সবই ভোগ করেছেন। শান্তিতে, আনন্দে থেকেছেন। কবির কর্মজীবন বা ব্যক্তিগত জীবনের বিশদ খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেননি। এ সব খোঁজ নেওয়ার মতো সেই শিক্ষা-দীক্ষা এবং মানসিকতা-ও তাঁদের ছিল না। এটা ভাববার মতো কোনো পরিবেশ-ও বাড়িতে কেউ ক'রে দেন নি। কবি থাকতেন তাঁর কর্মজীবন নিয়ে, একটা নীরব নিঃসঙ্গতা এবং নিজস্ব ভুবন নিয়ে।

কবির দিনটা শুরু কীভাবে হতো সে বিষয়ে শান্তিলতা দেবী বললেন, "সকালে উঠেই বাথরুমে চলে যেতেন। বাসায় দু'-তিনটে কাগজ নেওয়া হতো। আনন্দ-বাজার, যুগান্তর, স্টেট্সম্যান। কবি স্টেটসম্যান পছন্দ করতেন। কাগজটা নিয়ে বাথরুমে যেতেন।"

এভাবে শান্তিলতা দেবী কবির দৈনন্দিন জীবনের যে বিবরণ শুরু করলেন তাতে বোঝা যায় কবি তাঁর প্রাত্যহিক জীবনে একটা টাইট রুটিন অনুসরণ ক'রে চলতেন। এরপর কী হ'তো তা তিনি এভাবে ব'ললেন,

"ধুতি, পাঞ্জাবী, স্নো, পাউডার, সব কিছুই গোছগাছ করে রাখা থাকতো। তাঁর পোষাক পরতে পরতে যে সময়টুকু লাগে সেই সময়ের মধ্যে যদি খাবার তৈরী হতো তবে খেতেন, না হলে কেবল এক কাপ চা খেয়ে রওনা হতেন। মুখে কিছু বল্তেন না। বাইরে সকাল ৯টার মধ্যেই ঘর ভর্তি লোক তাঁর জন্য অপেক্ষা করতেন। কবি নীচে নেমে বাইরের ঘরে এসে বলতেন, 'হিজ মাস্টার্স ভয়েসে চলুন।' 'সেই এক ঘর লোক, ঘর শুদ্ধ লোক তাঁর পেছন পেছন যেতেন।"

এই ছিল কবির সকালের প্রাত্যহিক জীবন।

কবিকে কত লোক প্রতিদিন সকালে দেখতে আসতেন! কবিকে দেখার জন্য কবির বাড়িতে এসে প্রতিদিন সকালে অপেক্ষা করতেন কত লোক! এ বিবরণ অনেকেরই স্মৃতিকথায় আছে। এক সাক্ষাৎকারে লুৎফর রহমান জুলফিকার ব'লেছেন, কবিকে দেখতে এসে বহু লোক লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। ১৯৮৬-তে নজরুল একাডেমীর এক সভায় দেশের কয়েকজন বড় কবির উপস্থিতিতে মনসুরউদ্দিন ব'লেছেন, "আপনারা-ও কবি। আপনাদেরকে কেউ দেখতে আসেন না। কিন্তু নজরুলকে দেখতে এসে মানুষ-জন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। অপেক্ষা করতেন।"

শান্তিলতা দেবী বললেন, "কবি সকাল বেলা নাস্তা করে বেরিয়ে যেতেন। তারপর সারা দিন চা আর পান-জর্দা ছাড়া আর কিছু খেতেন না।"

এখানে-ও রয়েছে তাঁর এক সংযমী, সহনশীল ব্যবহারিক জীবনের পরিচয়, ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয়। এক ধরণের নিয়মানুবর্তিতার-ও পরিচয়।

www.pathagar.com

সকালে কবি কী নাস্তা করতেন, এই প্রশ্নের জবাবে শান্তিলতা দেবী বললেন: "পরোটা', 'মামলেট"।

কিন্তু এই নাস্তা সময়মতো না হ'লে-ও কোনো অনুযোগ না ক'রে কবি এক কাপ চা খেয়ে নীরবে গ্রামোফোন কোম্পানীর অফিসে রওয়ানা হ'তেন।

দুপুরের খাওয়ার ব্যাপারে শান্তিলতা দেবী বললেন, "সকালে রান্না হলো। দুপুরে এলেন না। সন্ধ্যায়-ও এলেন না। এলেন অনেক রাত হলে। পরিমাণে খুব কম খেতেন।"

আয়োজন যতই থাকুক, কবি পরিমাণে যে খুব কম খেতেন, এ কথা-ও অনেকেরই স্মৃতিকথায় আছে। কবির প্রচণ্ড শারীরিক সামর্থ্য যখন ছিল তখন-ও তিনি খুব কম খেতেন। এ কথা দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের স্মৃতিকথায়-ও আছে।

হিজ মাস্টার্স ভয়েসের দারোয়ান দশরথের কাছে-ও তাঁরা শুনেছেন; বাইরে-ও কবি স্রেফ চা, পান, জর্দা ছাড়া আর কিছু খেতেন না। দোকান থেকে কিছু এনে দিলে-ও না।

কেন? স্রেফ নিয়মানুবর্তিতা? সংযম? না আরো কিছু?

শান্তিলতা দাশগুপ্তার কাছে জানা গেল, রান্নার ব্যাপারে কবির একটা পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার অবশ্য ঠিকই ছিলো। শান্তিলতা দেবীর ভাষায়, "ওঁনার একটা নিয়ম ছিলো: রান্না ওঁনার স্ত্রীকেই করতে হবে। কবি খেতেন তাঁর স্ত্রী এবং আমার হাতে। কবি আর কারো হাতে খেতেন না।"

কবি কী খেতেন? কী কী খেতে পছন্দ করতেন?

শান্তিলতা দেবী বললেন : "কবি পছন্দ করতেন বড় বড় কই মাছ সরষে দিয়ে রান্না করা। ঝিঙে পোস্ত। চিংড়ি মাছের মালাইকারী, শুক্তো। ঝরঝরে খিচুড়ি।

ঝিঙে পোস্ত প্রতিদিন করতে হতো।"

রীচ ফুড বলতে যা বোঝায়, এগুলো কি তাই?

বোধ হয় না।

শান্তিলতা দেবী বললেন: "আয়োজন তো অনেক কিছুই করা হতো! কিন্তু কবি খেতেন খুবই সামান্য।"

ব্যবহারিক জীবনে সৌজন্যের ধার নজরুল বোধহয় বড্ড বেশী ধারতেন। কর্মজীবনে কোথাও, এমন কি, সংসারিক জীবনে-ও তিনি কখনো রূঢ় হননি। শান্তিলতা দেবী জানিয়েছেন, কেবল পরিবারের লোকজনদের প্রতি কেন, চাকর-বাকরদের সঙ্গেও তিনি কখনো চিৎকার করে কথা বলেন নি। কাউকে কখনো তিরস্কার করেননি। তাঁর একটা কণ্ঠস্বরই কেবল সরবে শোনা যেতো, সে তাঁর

www.pathagar.com

দিলখোলা হাসি, অট্টহাসি। শান্তিলতা দেবী এটাকে অট্টহাসিই বলেছেন। আমি এর প্রতিবাদ করবো না। কেননা, দেহ ও মনের একটা সংগঠন হিসাবে যে মানুষ নজরুল, তাঁর ব্যবহারিক জীবনের সুখ-দুঃখের, আনন্দ ও যন্ত্রণার প্রকাশ পথ ছিলো এই অট্টহাসি। আমার বিশ্বাস, ব্যবহারিক জীবনে মানুষ নজরুলের ইমোশনাল্ ডিসচার্জটা হতো মূলত এই একটি জায়গায়। মানবিক মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত, সংস্কৃতি মনস্ক, যথার্থ সৌজন্য পরায়ণ যে নজরুল তাঁর পক্ষে ব্যবহারিক জীবনে কারো প্রতি কখনো রূঢ় হওয়া সম্ভব-ও ছিলো না। কিন্তু সমাজ সচেতন নজরুল প্রয়োজনে যথোপযুক্ত কঠিন হতে পেরেছেন তাঁর সাহিত্যে, সঙ্গীতে, এমন কি, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনেও। তাঁর আবেগ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ, যথার্থ ইমোশনাল ডিসচার্জটা ঘটেছে ঠিক এখানেই। কেননা, সরাসরি সামনাসামনি চোখে চোখ রেখে চক্ষু লজ্জা পাওয়ার দায় এখানে তাঁর ছিলো না। সে কারণে নজরুলের ব্যক্তিত্বকে জানতে হলে সেটা খুঁজতে হবে তাঁর সাহিত্যে, তাঁর লেখনীতে, তাঁর রচনায়। একথাটা নজরুল তাঁর অনেক অভিভাষণে, নিবন্ধে, কবিতায় ও গানে বলেছেন।

নজরুলের আসল জীবনী, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, তাঁর নিজস্ব কথাগুলো,- সবই মূলত রয়ে গেছে তাঁর সৃষ্টিতে। তাই তাঁর জীবনী লিখতে হ'লে তাঁর সৃষ্টির ব্যবহারকেও জানতে হবে।

ভাবা যায়, একটা মানুষ সারা দিনব্যাপী তাঁর কর্ম ও সৃজনশীল জীবনের দায়-দায়িত্ব সেরে অনেক রাতেও যখন বাড়ী ফিরছেন তখনও আহার ও বিশ্রাম তাঁর লক্ষ্য নয়। সামান্য খাচ্ছেন, পরিবার পরিজনদের সঙ্গ দিচ্ছেন। সেই সঙ্গে তাঁর আপন নিঃসঙ্গতা-ও ভুলছেন। ব্যবহারিক জীবনে কোথাও কারো কাছে কোনো অনুযোগ করছেন না, অভিযোগ করছেন না। কেবল খেলার আনন্দ নয়, পরিবার পরিজনদের মধ্যে থাকার সময়টুকুতে-ও যে নিঃসঙ্গতা ভোলার একটা তাগিদ ছিল সেটা একটু খতিয়ে দেখলে বোঝা যায়।

কবির মধ্যে একটা অসহায় ভাব ছিল, একটা একাকীত্ব ছিল।

তাঁর অন্যতম তাগিদটা যে কোথায় সেটা বোঝা যায় শান্তিলতা দেবীর সেই উক্তিতে যখন তিনি বলেন যে, ঘুমাতে চাইলে-ও কবি তাঁদেরকে জাগিয়ে রেখে আবেদন করতেন, “আর একবার। এই এবারটি, এবারটি” করে খেলা রাত চারটা পর্যন্ত চলতো।” সম্ভবত কবি যতক্ষণ নিজে না ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। শান্তিলতা দেবী জানিয়েছেন, তাস খেলা তাঁকে এবং গিরিবালা দেবীকে কবি নিজেই শিখিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

বোঝা যায়, কবি তাঁর নিজের সমস্যাগুলো বুঝতেন এবং এগুলো থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখার তাগিদে একটা পরিকল্পনা নিয়ে-ও চলতেন।

এর পর কবির প্রাত্যহিক জীবন?

সকালে ঘুম থেকে ওঠার আগে কবির মাথার কাছে খবরের কাগজ রাখা থাকতো। কবি ঘুম থেকে ওঠার আগে থেকেই নীচের বাইরের ঘরে দর্শনার্থী ও অন্যান্য যে সব ব্যক্তি বিভিন্ন কাজে আসতেন তাঁদের ভিড় জমতে থাকতো। বাড়ীর লোক কবিকে কেউ কখন-ও ঘুম থেকে জাগাতেন না। ঘুম থেকে কবি নিজে যখন উঠতেন তখন উঠতেন। পরিবারে এখানে-ও তাঁর জন্য একটা প্রয়োজনীয় নিয়ম কাজ করতো। যতটুকু ঘুম তাঁর প্রয়োজন হ'তো ততটুকু তিনি ঠিকই ঘুমাতেন।

ঘুম থেকে উঠে কবি তাঁর মাথার কাছে রাখা প্রভাতী খবরের কাগজ 'দি স্টেটস্‌ম্যান' নিয়ে যেতেন বাথরুমে। ব্যস্ত কবি এই সময়টায় সারা দুনিয়ার ঘটনাবলীর ওপর চোখ বুলিয়ে নিতেন। এরপর ঢুকতেন সোজা গোসলখানায়।

এর পর ঘরে, যেখানে থাকতো সিঙ্গাপুরী মাদুর পাতা সেখানে গিয়েই দাঁড়াতেন তিনি। সেই মাদুরের ওপরই সাজানো থাকতো তাঁর কাপড়, স্নো, পাউডার।

কবি একটু প্রসাধন করতেন।

কবি পরতেন সাদা ধুতি, গরদের পাঞ্জাবী, ওড়না (উত্তরীয়), কখনো গেরুয়া রঙের আবার কখনো-বা ঘিয়ে রঙের। পায়ে নাগরা জুতো। কখনো সখনো পাম্প সু।

এভাবেই মানুষটাকে পাওয়া যাচ্ছে।

মানুষটার প্রাত্যহিক কর্মজীবন শুরু হ'তে যাচ্ছে এভাবে।

পোশাক পরতে পরতে যদি দেখতেন খাবার তৈরী হয়েছে, খাবার দেওয়া হয়েছে তাহলে খেতেন। তা না হলে এক কাপ চা খেয়েই রওয়ানা হতেন।

খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন না।

খাওয়ার জন্য অনুযোগ-ও করছেন না।

সকালে তাঁর পছন্দসই খাবার, মানে নাস্তা ছিলো পরোটা এবং মামলেট। এখানে পছন্দ আছে, কিন্তু বাহুল্য নেই। তবু এটুকু না জুটলে-ও তিনি কোনো অভিযোগ বা অনুযোগ জানাতেন না। খাবারের জন্য অপেক্ষা-ও করতেন না। এক কাপ চা খেয়েই রওয়ানা হতেন এবং বাইরে গিয়ে-ও চা এবং পান জর্দা ছাড়া আর

www.pathagar.com

কিছু খেতেন না। পিয়ন দারোয়ানরা দোকান থেকে এনে দিতে চাইলে-ও নয়। খিলি পান অনেক করে বাড়ী থেকেই বানিয়ে দেওয়া হতো।

শান্তিলতার নিজের উক্তি, 'পঞ্চাশ-ষাটটি খিলি পান সেজে দিতাম। কবি বাইরে কেবল এই পান জর্দা খেতেন। আর কখনো চা।'

শান্তিলতা দেবীকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কবি মদ খেতেন কিনা।

তিনি দৃঢ়তার সাথে বললেন, "না। কখ্খনো না।"

একটা সুশৃঙ্খল, সংযত, সহনশীল ব্যক্তি জীবন কবির ছিল।

শান্তিলতা দেবী জানালেন, "মদ কেন, সিগারেট-ও তিনি খেতেন না। চা এবং পান জর্দা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই দুটো জিনিসেই ছিলো কবির নেশা এবং হয়তো কখনো কখনো এগুলোই তাঁর আহার-ও বটে।"

প্রাত্যহিক জীবনের এখানে-ও তাঁর একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল। যেমন স্বাতন্ত্র্য ছিল তাঁর সাহিত্যে, সঙ্গীতে এবং আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনায়। এ সবই তাঁর ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ। একটা মানুষের ব্যক্তিত্ব থেকে এগুলো বিচ্ছিন্ন কিছু হয় না।

শান্তিলদা দেবী জানিয়েছেন, "দুপুরের খাওয়া তো প্রায়ই হতো না। রাতে ফিরে-ও খেতেন খুবই সামান্য। গোস্তের চেয়ে মাছই তিনি পছন্দ করতেন বেশী। বাড়ীতে গোস্ত এলে আসতো মুরগী এবং খাসির গোস্ত। গরুর গোস্ত কখনো আসতো না। মাছের মধ্যে কবি পছন্দ করতেন বড় বড় কই সরষে বাটা দিয়ে রান্না করা। শুক্তো এবং বিশেষত পোস্ত দিয়ে রান্না করা ঝিঙে।"

কবির ঘরোয়া পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে শান্তিলতা দেবী ব'ললেন,

"কবি বাড়ীতে যখন থাকতেন তখন পরতেন লুঙির মতো করে ভাঁজ করা ধুতি এবং গেঞ্জি।"

বাইরে কবির খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি সব ব্যাপারেরই খবর হিজ মাস্টার্স ভয়েসের দারোয়ান দশরথের কাছ থেকে পেতেন কবি পরিবার। বিশেষত তাঁর শাশুড়ী। পরিবারে কার্যত শাশুড়ীর একটা কর্তৃত্ব কাজ করতো। কবি কেবল পরিবারে টাকা দিয়ে যেতেন। কবি তাঁর নিজের ইচ্ছার-অনিচ্ছার ব্যাপারটা পরিবারের আর কারো ওপর চাপিয়ে দিতে চাইতেন না।

www.pathagar.com

কৃষ্ণনগরে চাঁদ সড়কের গ্রেস কটেজের বাসায় সপরিবারে নজরুল। কবির কোলে শিশুপুত্র বুলবুল, বাঁ দিকে শ্বাশুড়ি গিরিবালা দেবী, ডান দিকে কবি-পত্নী প্রমীলা নজরুল ইসলাম এবং বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে বুলবুলের সেবিকা

www.pathagar.com

।। দুই ।।

কবির এই রুটিন বাঁধা জীবনের কথা মনে রেখে ইন্দুবালা দেবীর কাছে শোনা একটা ঘটনার কথা আমি জানতে চাইলাম শান্তিলতা দেবীর কাছে। সেটা কাননবালা দেবী প্রসঙ্গে। এ বিষয়ে আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস-ও করেছেন। এ বিষয়ে প্রশ্ন করার ব্যাপারে অনেককে দেখেছি অতিরিক্ত উৎসাহী। শান্তিলতা দেবীকে আমি এ বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। দেখলাম তিনি উত্তর দিতে দ্বিধাবোধ করছেন। এটা অবশ্য দ্বিধাবোধ করার বিষয়-ও বটে। কিন্তু যা শোনা যায় সেটা আদৌ সত্য কিনা, কিংবা সত্য হ'লে-ও তা কতখানি সত্য সেটা সবারই জানা দরকার। গুজব সৃষ্টির সুযোগ বা সংস্থান রাখাটা কখনোই যুক্তিযুক্ত হ'তে পারে না। গুজব বা বানোয়াট গল্প পছন্দ করার ব্যাপারটা গ্রাম্যতা। এমন রুচির লোক আমাদের সমাজে আছে।

আমি তাঁকে বললাম, ইন্দুবালা দেবীর উপস্থিতিতে তাঁর পুত্রবধূর কাছে শুনেছিলাম কবি-পত্নী নাকি কাননবালা দেবীকে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে চড় মেরেছিলেন। এটা কতখানি সত্য?

ইন্দুবালা দেবী কেবল সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী নন, কবির একজন ভক্ত। এ বিষয়ে প্রশ্ন করে আমি সরাসরি তাঁর মুখ দিয়ে কিছু শুনতে পাইনি। তিনি আমাকে বলেছিলেন, কবিকে তাঁর বাড়ীতে কখনো আমন্ত্রণ করার সাহস পাননি তিঁনি। কবিকে তিনি যথার্থই শ্রদ্ধা করতেন। যখনই যেতাম, দেখতাম কবির প্রসঙ্গ উঠলেই তাঁর চোখ দু'টো কান্নায় ভিজে যেতো। চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু নামতো। কোনো নারী যখন এ রকম কাউকে শ্রদ্ধা করেন, ভক্তি করেন, কারো প্রতি যখন এ রকম আবেগ পোষণ করেন তখন তাঁর সততা সম্পর্কে, তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে, তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে তাঁর একটা আস্থা থাকে।

যাই হোক, এই চড় মারার কথাটা শুনেই শান্তিলতা দেবী প্রতিক্রিয়ায় খাড়া হয়ে উঠলেন। খুব জোর দিয়েই বললেন, "কখনোই না। কবি-পত্নী মারার লোকই ছিলেন না। মেরেছিলেন তাঁর শাশুড়ী।"

এতটুকুই শোনার পর বুঝলাম, অন্তত প্রমীলা নজরুল ইসলামের চরিত্রের সঙ্গে এই গুজবটা আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যেমন সঙ্গতিপূর্ণ নয় নজরুল চরিত্রের সঙ্গে কোনো রকম লাম্পট্যের, উচ্ছৃঙ্খলতার।

এর পর ঘটনাটি তিনি বললেন।

হিজ মাস্টার্স ভয়েস গ্রামোফোন কোম্পানীর দারোয়ান দশরথের কাছে কবির শাশুড়ী গিরিবালা দেবী খবর পেতেন যে, কাননবালা দেবী কবিকে দেখা করার জন্য

www.pathagar.com

চিঠি, চিরকূট পাঠাতেন। শান্তিলতা দেবী বলেন, "কবি বিদ্যাপতি এবং অন্যান্য যে ক'টি ছায়াছবি পরিচালনা করেছিলেন, সেগুলোর প্রত্যেকটিতেই কাননবালা দেবী অভিনয় করেছেন।"

এই কাননবালা দেবীর সঙ্গে কবির মানসিক বা অন্য কোনো রকম ঘনিষ্ঠতা আছে কিনা, সে বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতেন কবি-পত্নী নয়, কবির শাশুড়ী গিরিবালা দেবী।

হিজ মিস্টার্স ভয়েসের দারোয়ান দশরথ এসে একদিন কবির শাশুড়ী গিরিবালা দেবীকে খবর দিলো যে, কাননবালা দেবীর চিঠি পেয়ে কবি তাঁর বাড়ীতে গেছেন। ব্যাপারটি যে একটা মানসিক সান্নিধ্য কামনার, সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়। কবির শাশুড়ী গিয়ে দেখলেন নজরুল ইসলাম কবিতা আবৃত্তি করছেন আর কাননবালা তা নিবিষ্ট মনে শুনছেন। কবির শাশুড়ী তখন তাঁর পায়ের চটি জুতো খুলে কাননবালা দেবীকে মারলেন।

আপত্তিকর কিছু না দেখে-ও গিরিবালা দেবী যে কাননবালা দেবীকে পায়ের স্যান্ডেল খুলে মেরে বসলেন, এর কারণ তিনি মারবেন ব'লেই মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে গিয়েছিলেন।

কাননবালা দেবী কিছুই বললেন না। কোনো হইচই করলেন না। নীরবেই এ সব কিছুই সহ্য করলেন। এ বিষয়ে শান্তিলতা দেবী মন্তব্য ক'রেছেন যে, তাঁর বাড়ীতেই যে সব লোকজন চাকর-বাকর ছিলো তাদেরকে ইঙ্গিতটুকু করলেই কবির শাশুড়ীকে তারা গুঁড়িয়ে দিতে পারতো। কিন্তু তিনি তা করলেন না। সম্ভবত কবির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধের কারণেই। তাঁর নিজস্ব রুচিবোধের একটা ব্যাপার-ও নিশ্চয়ই ছিল।

কবি-ও এতখানি ভদ্র, সৌজন্যপরায়ণ এবং সহনশীল ছিলেন যে, এ রকম একটা অবাঞ্ছিত আচরণের বিরুদ্ধে কোনো রকম প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলেন না। নীরবে উঠে বাড়ী চলে গেলেন। বিদ্রোহী কবি, ভাঙার গানের কবির এ এক বিস্ময়কর সর্বংসহা রূপ। ব্যক্তিগত জীবনে, ব্যবহারিক জীবনে মানুষটা ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, সহনশীল, সৌজন্যপরায়ণ এবং অধিকাংশ সময়েই সর্বংসহা। ব্যবহারিক জীবনে মানুষের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করাটা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। অন্তত নিজের ব্যাপারে সব কিছু সহ্য করার একটা মানসিকতা তাঁর ছিল। তিনি কখনো প্রতিবাদ করলে করতেন অন্যের ব্যাপারে।

www.pathagar.com

শান্তিলতা দেবী বললেন, "কাননবালা দেবী সম্পর্কে ওঁনার শাশুড়ীর কাছেই শুনেছি। নাতনী বলে এক দিন বলেছিলেন আমাকে।"

কবির শাশুড়ী যে এই ঘটনার কথা সাধারণত কাউকে ব'লতে চাইতেন না সেটা কবির পালিত কন্যা শান্তিলতা দেবীর এই উক্তি থেকেই বোঝা গেলো।

শান্তিলতা দেবী পুনরাবৃত্তি করে বলেছিলেন, "কবি-পত্নী মারার লোকই ছিলেন না। মেরেছিলেন তাঁর শাশুড়ী।"

শান্তিলতা দেবীর এই উক্তি থেকে বোঝা গেল, কবি-পত্নী সম্পর্কে তিনি এক রকম ধারণা পোষণ করতেন এবং কবির শাশুড়ী সম্পর্কে আর এক রকম।

কবির শাশুড়ী গিরিবালা দেবী সম্পর্কে শান্তিলতা বললেন, "তিনি দেখতে খুবই সুন্দরী ছিলেন। পড়াশুনা তাঁর ছিলো খুব। তিনি ভাল বাঙলা জানতেন। প্রতি দিন খবরের কাগজ না পড়ে কিছু খেতেন না।"

শান্তিলতা দেবী কবির শাশুড়ী সম্পর্কে সরাসরি কোনো বিরূপ মন্তব্য করেন নি। বরং তাঁর কোনো কোনো গুণের প্রশংসাই তো করলেন। তাঁর কাছে জানতে চাইলাম, "কবি-পত্নী কেমন মানুষ ছিলেন? সংসারে তাঁর ভূমিকাটাই-বা কেমন ছিল?" শান্তিলতা দেবী বললেন,

"অন্যদিকে কবি পত্নী?

অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির মহিলা ছিলেন তিনি।"

শান্তিলতা দেবী বললেন : "কবির একটা নিয়ম ছিলো, রান্না তাঁর স্ত্রীকেই করতে হবে। নীচে রান্না ঘরে তিনি সারাদিনই কাজ করতেন। কবি-পত্নী সকাল বেলা নীচে নামতেন। সব কাজ সেরে দুপুরে খেয়ে ওপরে উঠতেন। তিন তলা বাড়ী ছিলো। রাতে ঘুমাতে গিয়ে ঘুমাতে পারতেন না। রাতে শোয়ার সময় পিঠে যন্ত্রণা হতো তাঁর। ব্লাড পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন, "টাইফয়েড"। আমরা সবাই হাসতাম। বলতাম, "সুস্থ মানুষের আবার টাইফয়েড কী?"

বাইরে থেকে তো সে-ভাবে বোঝা যেতো না। আর সে-ভাবে বোঝা যেতো না ব'লেই তাঁরা এভাবে সমস্ত ব্যাপারটা হাল্‌কাভাবে দেখেছিলেন।

শান্তিলতা দেবীর বিবরণ : "ডাক্তার বললেন এক্স-রে করাতে। মাসখানেক পর একদিন এক্স-রে করা হলো। ডাক্তার বললেন, প্লাস্টার করে এক বছর ঘরে শুয়ে

www.pathagar.com

থাকতে হবে। আমরা বললাম, সুস্থ্ লোক প্লাস্টার করে ঘরে শুয়ে থাকবে? সে কী কথা! কবি করতে দিলেন না। কবি-পত্নীও চাইলেন না। হঠাৎ একদিন সকালে আর উঠতে পারলেন না। একদিকে প্যারালাইসিস হয়েছে। বললেন, "উঠতে পারছি না।"

কবি-পত্নীর চিকিৎসার ব্যাপারে শান্তিলতা দেবী তাঁর দেওয়া বিবরণে ব'ললেন:

"সব ধরণের চিকিৎসা হয়েছে। টোট্কা, অ্যালোপ্যথি, কবিরাজী ইত্যাদি সব কিছুই। শেষ পর্যন্ত ডায়মন্ড হারবারের একজন কবিরাজ এসে মালিশ দিলেন। পায়খানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। এর পর পায়খানা হতে থাকলো নিয়মিত। পরে বেড্ শো হলো।"

শান্তিলতা দেবী ব'লে চ'ললেন:

"আবার সেই কবিরাজ। ডায়মন্ড হারবারের কদমতলার অজ পাড়াগাঁয়ের একজন কবিরাজ ওষুধ দেওয়ায় বেড্ শো ভালো হয়ে গেলো।"

শান্তিলতা দেবী বললেন, "কবি পত্নী অসুস্থ্ হয়ে পড়েন কবির অসুস্থ্তার ছ'-সাত বছর আগে ১৯৩৪-৩৫ সালে।" কবির পৌত্রী খিলখিল কাজী শুনেছে, "১৯৩৫ সাল"। খিলখিল বললেন, 'ওঁনার (শান্তিলতা দেবীর) বড় মেয়ের জন্ম দিনে খেয়ে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন।"

পত্নীর চিকিৎসার ব্যাপারটায় কবি খুব সিরিয়াস ছিলেন, খুবই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পারিবারিক জীবনে তাঁর পত্নীর ভূমিকার একটা স্বীকৃতি-ও বটে এটা। পত্নীর নিরাময়ের ব্যাপারে সব রকমের প্রয়াস নিতে প্রস্তুত ছিলেন তিনি।

কবি-পত্নীর সমস্ত চিকিৎসা যখন ব্যর্থ হলো তখন বরোদা গুপ্ত বলেছিলেন, কবিকে তাঁর পত্নীর মাথার কাছে বসে ধ্যান করতে। পত্নীর সব রকমের চিকিৎসা করে কবি যখন সর্বস্বান্ত তখন এই পন্থা বাতলে দিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের লালগোলা স্কুলের হেড মাস্টার বরোদা চরণ গুপ্ত। অসহায় কবি রাতে তাঁর পত্নীর মাথার কাছে বসে ধ্যান করতেন। তখন কবির চোখ-মুখের হাব-ভাব এ রকম হ'তো যে, চেহারাটাই পাল্টে যেতো। কবি-পত্নী ভয় পেতেন। কবির পালিত কন্যা খুকুকে (শান্তিলতা দেবীকে) বলতেন ও সময় তাঁর পাশে থাকতে। কবির ধ্যানের সময় খুকু কবি-পত্নীর পাশে গিয়ে বসতেন।

www.pathagar.com

এই সমস্ত বিবরণই শান্তিলতা দেবী দিলেন। প্রসঙ্গত একটা কথা আমি জেনে নিতে চাইলাম।

প্রশ্ন করলাম : "কবিকে কি পূজো করতে দেখেছেন?"

তিনি জবাব দিলেন, "কবিকে পূজো করতে দেখিনি। কবির শাশুড়ী ঘরে পূজো করতেন। তাঁর আলাদা ঘর ছিলো। স্ত্রী পূজো অর্চনা করতেন না।"

এটা কবির পালিত কন্যা শান্তিলতা দেবীর নিজের উক্তি।

জিজ্ঞেস করলাম, "আবদুল আজীজ আল-আমান লিখেছেন যে, বাড়ীতে তুলসীতলা ছিলো। কথাটা কি ঠিক?"

জবাবে তিনি বললেন, "কোন তুলসীতলা ছিলো না।"

গপ্পো রচনার লোভ সংবরণ করতে না পেরে কবির জীবন বিষয়ক বর্ণনায় অনেকেই দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রশ্ন করলাম, "কবি-পত্নী কোন্ বাড়ীতে থাক্তে অসুস্থ হন?"

জবাবে তিনি বললেন; "কবি-পত্নী হরি ঘোষ স্ট্রীটের বাড়ীতে থাকতে অসুস্থ হয়ে পড়েন।"

সময়টাকে শান্তিলতা দেবী একটা ঘটনার কথা উল্লেখ ক'রে শনাক্ত করতে চাইলেন। সেই সময়টার কথা তিনি উল্লেখ করলেন এভাবে:

"বজবজে আমার বড় মেয়ের অন্ন প্রাসনে খেয়ে এসে কবি-পত্নী অসুস্থ হয়ে পড়েন। বড় মেয়ের বয়স এখন (এই মে ১৯৮৭-তে) ছেচল্লিশ থেকে আটচল্লিশ। বড় মেয়ের নাম মালবিকা সেনগুপ্ত (দত্ত)। দ্বিতীয় মেয়ের নাম বনশ্রী সেনগুপ্ত। কবি একে মৌরী বলে ডাকতেন। উঁনি (কবি) নিয়েছিলেন। (আমার) মা মুখ সিঁটকাতেন বলে। কবি অসুস্থাবস্থায় তৃতীয় মেয়ের নাম রাখলেন মীনাক্ষী। কিন্তু ডাকতেন তানি বলে।"

শান্তিলতা দেবী তাঁর বড় মেয়ে মালবিকা সেনগুপ্তার বয়স সঠিক বলেন নি। বয়স ৪৬ হ'লে হয় ১৯৪১ সাল। ৪৭ হ'লে হয় ১৯৪০। ৪৮ হ'লে হয় ১৯৩৯।

www.pathagar.com

কবি-পত্নী প্রমীলা নজরুল ইসলাম

www.pathagar.com

।। তিন ।।

প্রশ্ন করলাম, "স্বগ্রাম চুরুলিয়ার সঙ্গে কবির যোগাযোগ ছিলো কী রকম?"

উনি জবাব দিলেন, "ছোট ভাই আলী হোসেন আসতেন। বাড়ী যাওয়ার জন্য ব্যাকুলতা, মায়ের জন্য ব্যাকুলতা ছিলো না।

কবির অসুস্থতার অনেক পরে দুই ছেলের বিয়ের পর ওদের বউকে নিয়ে আমরা চুরুলিয়া গেছি।"

প্রশ্ন করলাম : "কবি গাড়ী কিনেছিলেন কখন?"

শান্তিলতা দেবী বললেন : "কবি সতীনাথ রোডের বাসায় থাকতে গাড়ী কিনেছিলেন। ক্রাইসলার গাড়ী। হুড্ খোলা গাড়ী। প্রথমে ড্রাইভার ছিলো নেপালী। চন্ডী নামে। পরের ড্রাইভার আমাদের বাঙ্গালী। নাম হরিপদ। হরিপদ্ ড্রাইভার বহুদিন ছিলো।"

শান্তিলতা দেবী বললেন : "ক্রাইসলার গাড়ীটিতে কবি পরিবারের সবারই জায়গা হতো। গাড়ীটি কবি-পত্নী অসুস্থ হওয়ার পর বিক্রি হয়ে যায়। শ্যামবাজার স্ট্রীটের বাসায় থাকতে-ও বেশ কিছুদিন গাড়ীটি ছিলো।"

প্রশ্ন করলাম : "কবি যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন তাঁর পরিবারে কারা থাকতেন?"

শান্তিলতা দেবী জবাব দিলেন : "শ্যামবাজার স্ট্রীটের বাসায় অসুস্থ হওয়ার সময় পরিবারে তাঁর শাশুড়ী গিরিবালা দেবী, স্ত্রী প্রমীলা নজরুল ইসলাম, দুই ছেলে : কাজী সব্যসাচী ইসলাম এবং কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম, খোকা (শান্তিলতার ভাই) বিজয় সেনগুপ্ত এবং আমি স্থায়ীভাবে থাকতাম। কাজ করার লোক ঊষা এবং কালীপদ গুহ রায়-ও সে সময় কবি পরিবারে থাকতেন। কালীপদ গুহরায় থাকতেন কবির খাতা দেখার সময় থেকে। কবি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকের বাংলা খাতা দেখতেন।"

প্রশ্ন ক'রলাম : "কাজী সব্যসাচী ইসলাম এবং কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম কোন্ কোন্ স্কুল এবং কলেজে পড়েছেন।"

তিনি জবাবে বললেন : "প্রথমে হরিঘোষ স্ট্রীটের পাশে আদর্শ বিদ্যামন্দিরে। পরে গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে শ্যামবাজার টাউন স্কুলে।"

কোন্ কলেজ সেটা স্মরণ করতে শান্তিলতা দেবী একটু সময় নিলেন।

একটু চিন্তা করে বললেন : "সম্ভবত জয়পুরিয়া কলেজে।"

প্রশ্ন করলাম : "কবি পরিবার কি কখনো গ্রে স্ট্রীটের কোনো বাসায় থাকতেন?"

তাঁর জবাব : "গ্রে স্ট্রীটে কবি থাকতেন না।"

www.pathagar.com

কবি পরিবার যখন কৃষ্ণনগরের চাঁদ সড়কের গ্রেস কটেজে থাকতেন, শান্তিলতা সেনগুপ্তা সে সময় বালিকা বয়সে তাঁর মায়ের সঙ্গে সেই বাড়ীতে আসেন। এর পর অর্থাৎ কৃষ্ণনগরের পর মসজিদ বাড়ী স্ট্রীটের কথা স্মরণ করতে পারেন শান্তিলতা দেবী।

কিন্তু কৃষ্ণনগরের পরে এবং মসজিদ বাড়ী স্ট্রীটের আগে কবি পরিবার আরো চারটি ঠিকানায় ছিলেন। এই ঠিকানা তিনটি হলো যথাক্রমে ১৫, জেলিয়া টোলা স্ট্রীট; ১১, ওয়েলেসলি স্ট্রীট এবং ইন্টালী এলাকায় ৮/১, পানবাজার লেনে।

পানবাজার লেনের বাসা প্রসঙ্গে আমি জিজ্ঞেস করলে শান্তিলতা দেবী অবশ্য বললেন: "এখানে আমি বেশী দিন থাকিনি। আমার বিয়ের তোড়জোড় করছিলেন মা। স্বামী বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত ১৯৭১ সালে মারা যান।"

আর একবার তিনি বললেন: 'কৃষ্ণনগরের পর মসজিদ বাড়ী রোডে থাকতে মা নিয়ে গেলো। বিয়ে টিয়ে দিয়ে হঠাৎ এসে (কবিকে) খবর দিলো।'

শান্তিলতা দেবীর উক্তি: 'মসজিদ বাড়ী রোডের এক তলায় থাকতেন কবি।'

আসলে মসজিদ বাড়ী রোড নয়। মসজিদ বাড়ী স্ট্রীট। মসজিদ বাড়ী স্ট্রীটে দু'টো বাড়ীতে থেকেছেন কবি। বাড়ী দু'টো যথাক্রমে ৫০/২ এ, মসজিদ বাড়ী স্ট্রীট এবং ৩৯/২, মসজিদ বাড়ী স্ট্রীট। এই মসজিদ বাড়ী স্ট্রীটে থাকতেই কবির দ্বিতীয় পুত্র বুলবুল মারা যায়। মসজিদ বাড়ী স্ট্রীটে শান্তিলতা ও বিজয় গুপ্ত উভয়েই ছিলেন।

উনি বললেন: "মসজিদ বাড়ীর পর সীতানাথ রোডে দু'টো বাড়ী। আগে একটা বাড়ী। সেই বাড়ীতে থাকতে বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। পরে এসে অন্য বাড়ী।

সীতানাথ রোডে পর পর দু'টো বাড়ী পাল্টানো হয়েছে।"

কোনো বাড়ীরই নম্বর শান্তিলতা দেবী স্মরণ করতে পারেননি। এই বাড়ী দু'টো হ'লো যথাক্রমে ৩৯, সীতানাথ রোড এবং ৩৭/১, সীতানাথ রোড।

শান্তিলতা দেবী বলেছেন: "সীতানাথ রোডের দু'টো বাড়ীই ছিলো দোতলা"।

৩৯ সীতানাথ রোডে থাকতে ১৯৩৪-এর ডিসেম্বরের দিকে ১৬ নম্বর বিবেকানন্দ রোডের ঠিকানায় কবি যৌথ উদ্যোগে "কলগীতি" নামে রেডিও ও গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকান ক'রেছিলেন। দোকানটি ১৯৩১-এ নিলামে বিক্রি হ'য়ে যায়।

সীতানাথ রোডের বাসায় থাকতে কবি যৌথ উদ্যোগে 'কলগীতি' নামে রেডিও ও গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকান প্রতিষ্ঠা করেন কি-না সে প্রশ্নের জবাবে শান্তিলতা দেবী বলেন: "কবি কোনো দোকান করেন নি।"

www.pathagar.com

তাঁর এই উক্তিটি অবশ্য সঠিক নয়। বোঝা যায়, ঘরের বাইরের খবর, কবির কর্ম-জীবনের অনেক খবরই তাঁরা রাখতেন না।

শান্তিলতা দেবী বললেন : "সীতানাথ রোডের পর কবি এসেছিলেন হরিঘোষ স্ট্রীটে।"

বাড়ীর নম্বরটা হলো ৫৩ জি, হরিঘোষ স্ট্রীট।

কাজের লোক ঊষা সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে শান্তিলতা দেবী বললেন : "ঊষা এসেছিলেন গ্রে স্ট্রীটের বাসায় থাকতে।" শান্তিলতা দেবী অবশ্য এর আগে বলেছেন যে, কবি গ্রে স্ট্রীটের বাসায় থাকতেন না।

কেউ কেউ অবশ্য তাদের স্মৃতিকথায় গ্রে স্ট্রীটের বাসার কথা উল্লেখ করেছেন।

শান্তিলতা দেবী বললেন : "বিবেকানন্দ রোডের পাশে ছিলো সীতানাথ রোড। এক তলা, দোতলা, পুরো বাড়ী ভাড়া নিয়ে থাকতেন কবি।

কোনো দিন দোকান করেন নি।"

কথাটা ঠিক নয়।

শান্তিলতা দেবী হয়তো জানতেন না।

শান্তিলতা দেবী ব'ললেন:

"শ্যামবাজারের বাড়ীটা ছিলো তিন তলা। গোটা বাড়ীটা ভাড়া নেওয়া হয়েছিলো। মালিক ডাঃ ডি. এল. সরকার থাকতেন পাশের বাড়ীতে।" শান্তিলতা দেবী জানিয়েছেন : "কবি পরিবার যুদ্ধের আগে শ্যামবাজার স্ট্রীটের বাসায় আসেন।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে।

কবি তাঁর সুস্থাবস্থায় শেষ যে বাসাটি ভাড়া নেন সেটা শ্যামবাজার স্ট্রীটের বাসা। এই ১৫/৪, শ্যামবাজার স্ট্রীটের বাসা থেকেই কবির শাশুড়ী গিরিবালা দেবী শেষবারের মতো রাগ করে চলে যান এবং নিখোঁজ হন।

গিরিবালা দেবী কবির অসুস্থতার পর নিখোঁজ হয়েছিলেন। গিরিবালা দেবী কেন নিখোঁজ হয়েছিলেন সে বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে শান্তিলতা দেবী বললেন : "এর আগে তিনি মাঝে মাঝে রাগ করে বালীগঞ্জে আমার ভাইয়ের বাড়ীতে অল্প এক-আধ বেলার জন্য আসতেন।"

শেষ বারের মত রাগ করে যাওয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বললেন : "মেয়ের অসুখ — জামাইয়ের অসুখ — শুশ্রূষা — গিরিবালা দেবীর মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলো —। অনিরুদ্ধের অসুখ হলো — তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হলো –। চলে গেলেন একদিন দুপুর বেলা —। যাওয়ার সময় চশমা নিয়ে গেছেন।"

এ কথা বলে শান্তিলতা দেবী বোঝাতে চাইলেন, চশমা নিয়ে গেছেন দেখে তারা বুঝলেন যে, গিরিবালা দেবী আর যা-ই হোক, আত্মহত্যা করতে যান নি।

www.pathagar.com

কবির শাশুড়ী সম্পর্কে বললেন : "খুব জ্ঞানী ছিলেন। অতিরিক্ত সুন্দরী ছিলেন। ভালো জ্ঞান ছিল বাংলায়। কাগজ পুরোটা না পড়ে খেতেন না।"

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁর "কাজী নজরুল ইস্‌লাম : স্মৃতিকথা"-য় উল্লেখ করেছেন যে, কাশীতে কেউ কেউ তাঁকে দেখেছেন।

প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায়, কবির অসুস্থতার আগে কবি পরিবারে যিনি দীর্ঘদিন ছিলেন, যিনি দুর্দিনে কবি পরিবারকে সর্বাধিক সাহায্য করেছিলেন বলে কবি পরিবারের লোকজন আজও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, কবির অসুস্থতার পর যিনি কবির ঘরের চৌকাঠ মাড়াতেন না, কবির অসুস্থতার পর যিনি কবিকে মধুপুর পাঠিয়েছিলেন, লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালে পাঠিয়েছিলেন, সেই কালীপদ গুহরায় বেনারসে মারা যান। কালীপদ গুহরায়কে শান্তিলতা দেবী কাকাবাবু বলতেন। বল্‌লেন, "কবির অসুস্থতার পর কাকাবাবুর জন্য ফ্যামিলিটা সে সময় বেঁচে গিয়েছিলো। উঁনি যদি না থাকতেন, কবির পরিবার বাঁচতো না।"

উঁনি বললেন : "কালীপদ গুহ রায়ের দুই ছেলে এবং স্ত্রী আছেন।" উঁনি তাঁদের ঠিকানা যোগাড় করে দিতে পারবেন বলে জানালেন।

কবির অসুস্থতার প্রসঙ্গে আসার আগে অন্য দু'-একটা বিষয়ে জানতে চাইলাম। বললাম, "কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা"-য় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখেছেন: ফজলী ব্রাদার্স 'চৌরঙ্গী' ফিল্মের ব্যাপারে কবিকে নাকি সব টাকা দেন নি।

এ বিষয়ে তিনি বললেন, "চৌরঙ্গী" বই হচ্ছে এটাই জানতাম। 'চৌরঙ্গী'র পরেও উচ্চস্তরের কাজ তাঁরা কবির কাছ থেকে আশা করেছিলেন। সে জন্য পরে তাঁরা বোম্বে থেকে কবিকে চিঠি দিয়েছিলেন যাওয়ার জন্য। চিঠিতে প্রতিশ্রুতি ছিলো সেখানে তাঁরা কবিকে গাড়ী দেবেন, বাড়ী দেবেন, ইত্যাদি।

চিঠির জবাবে কবি লিখলেন : "শুধু গাড়ী, বাড়ী নয়; বাগান-পুকুরও দিতে হবে।"

এ প্রসঙ্গেই শান্তিলতা দেবী বললেন: "কবি আমাকে কোনোদিন পিতার অভাব বুঝতে দেন নি। কবিকে আমার বাবার মতো মনে হয়েছিলো। বলতেন : "আমার যদি বাড়ী হয়, আমার মেয়েরও বাড়ী হবে। সেদিন কবির মাজারে গিয়ে আমার সেই কথাই মনে হচ্ছিল।"

www.pathagar.com

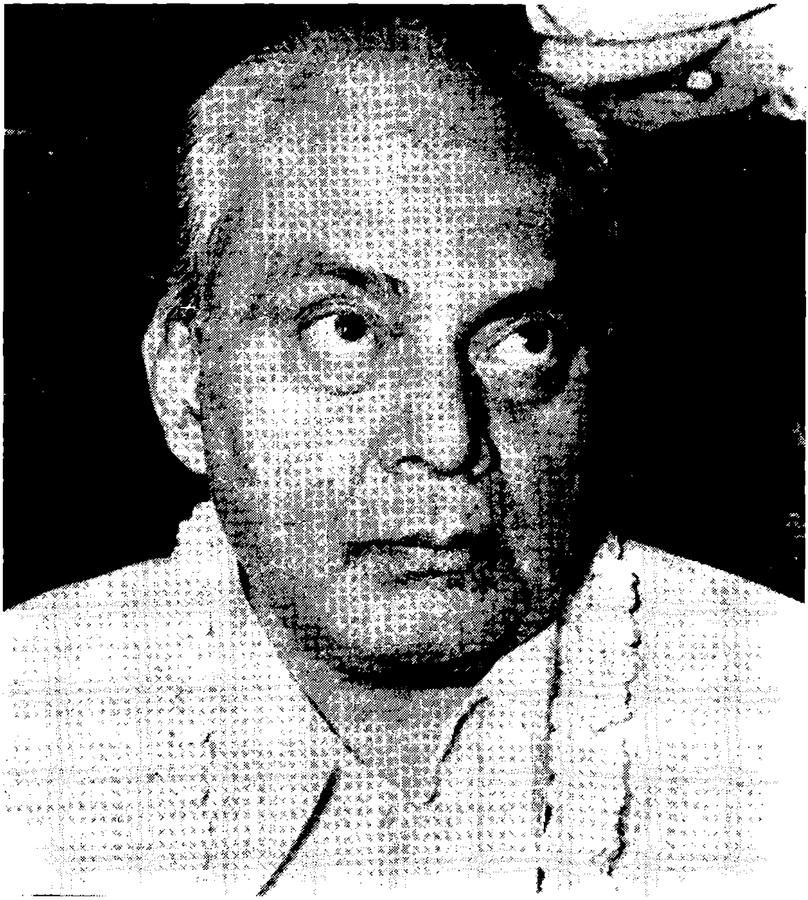

অসুস্থ অবস্থায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম

www.pathagar.com

।। চার ।।

এর পর এলাম আমার মূল জিজ্ঞাস্য, — কবির অসুস্থতার কথায়। এ প্রসঙ্গে তিনি যা বললেন তা যে কেবল অন্যান্য স্মৃতিকথায় আসেনি সেটাই নয়, সমস্ত বিষয়টাকেই নতুন করে চিন্তা করতে শেখায়।

সরাসরি স্বীকার না করলেও সম্ভবত সুফী জুলফিকার হায়দারের স্মৃতিকথার ওপর নির্ভর করে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদও তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে, কবি অসুস্থ হয়ে পড়েন ৯ জুলাই ১৯৪২ তারিখে। কিন্তু শান্তিলতা দেবী বলছেন, মহালয়ার দিন। মহালয়ার দিন অর্থাৎ ৯-১০-১৯৪২ তারিখে। ৯-৭-১৯৪২ তারিখ নয়। শান্তিলতা দেবীর সাক্ষাৎকার থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, কবি তাঁর অসুস্থতা সম্পর্কিত এক চিঠিতে যে ৯-১০-১৯৪২ তারিখ দিয়েছেলেন সেটা ঠিক। মহালয়ার দিনের বিশদ তারিখটা হচ্ছে : ৯ অক্টোবর ১৯৪২ মোতাবিক ২২ আশ্বিন ১৩৪৯ : ২৭ রমজান ১৩৬১ তারিখ শুক্রবার। শান্তিলতা দেবী বলেছেন : এ দিনই কবি প্রথম ভুল বকতে শুরু করেন। এ দিনই নাকি প্রথম তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই দিনটি আর একটা দিক দিয়ে উল্লেখ্য। বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শের-ই-বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক এদিন সিমলায় ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করেন।

সুফী জুলফিকার হায়দারের স্মৃতিকথায় আছে, তিনি মেদিনীপুরের ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় গিয়েছিলেন কবি পরিবারের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য রোজগার করতে। আবার তাঁর গ্রন্থেই আছে ১৬ অক্টোবর ১৯৪২ তারিখে কলকাতার পি ৩২ গনেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ থেকে ডাক্তার কবির হোসেনের চিঠি তিনি ডাঃ দাসকে দিয়েছিলেন।

কিন্তু 'আনন্দ বাজার পত্রিকা'-য় দেখছি : কবির অসুস্থতার মাত্র সাত দিন পর ১৬ অক্টোবর ১৯৪২ (২৯ আশ্বিন ১৩৪৯) তারিখ শুক্রবার 'প্রাতঃকাল থেকে ১৭ অক্টোবর সকাল পর্যন্ত প্রচন্ড ঘূর্ণিবাত্যা বাংলার ওপর দিয়ে' বয়ে যায়। 'কলকাতা থেকে মাত্র ৬০/৭০ মাইল দূরে' 'মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা' এই ঘূর্ণিবাত্যায় সব চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মেদিনীপুরের 'তমলুক মহকুমায় ৫/৬ হাজার লোকের প্রাণহানি' ঘটে। এ বিষয়ে তারিখ-তথ্য শান্তিলতা দেবীর স্মৃতিকথায় বিস্তারিত আসার আগে এবং তাঁর ও অন্যান্যদের স্মৃতিকথা যাচাই করে দেখার সুবিধার্থে পাঠকের খিদমতে পেশ করছি। সুফী জুলফিকার হায়দার এবং কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের স্মৃতিকথার ভিত্তিতে নজরুল জীবনীকাররা এ যাবৎ কবির অসুস্থতার তারিখ ৯-৭-১৯৪২ ধার্য করেছেন। বিশদ তারিখটি হচ্ছে মহালয়ার তিন মাস আগে ৯ জুলাই ১৯৪২ মোতাবিক ২৪ আষাঢ় ১৩৪৯: ২৪ জমাদিয়স্‌সানি ১৩৬১ তারিখ বৃহস্পতিবার। এই তারিখটায় ছিলো একাদশীর উপবাসের দিন।

www.pathagar.com

১০-১০-১৯৪২, চিঠির এই তারিখ কবির অসুস্থতাজনিত ভুল বলে অভিহিত করে অনেকে তিন মাস পিছিয়ে এনে চিঠির তারিখ ১০-৭-১৯৪২ ধার্য ক'রে কবি এর আগে দিন অসুস্থ হয়েছেন বলেছেন। কবি নাকি এর আগের দিন রাত দশটায় বাড়ী ফিরেছিলেন। রাতে খাওয়া দাওয়ার সময়, বিশেষ কিছু খাননি। অসুস্থ ছিলেন, ইত্যাদি।

আবার কেউ কেউ এই তারিখেই কবির ওপর একটা হামলা হয়েছিলো এবং সেই কারণেই অসুস্থতা, এ সব বলেছেন।

মহালয়ার দিনের যে বিবরণ শান্তিলতা দেবীর সাক্ষাৎকার পেয়েছি সেটা পরে বিস্তারিত পেশ করছি। সে বিবরণ সম্ভবত ঠিকই আছে। মানসিক বিপর্যয় হয়তো ওই সময়েই দেখা গিয়েছিলো। কিন্তু এর ঠিক মাস তিনেক আগে-ও যে একটা কিছু ঘটেছিলো, এমনটা বিশ্বাস করার-ও হয়তো অনেক কারণ আছে। নবযুগ মামলার একটা রায় থেকে-ও ধারণা করা যায় যে, কবি মোটামুটি এই রকম সময় থেকেই নিয়মিত অফিসে গিয়ে তাঁর দায়-দায়িত্ব পালন করতে পারছিলেন না।

১৯৪২ সালের ৯ জুলাই তারিখটাকে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় দেখা দরকার। ১ জুলাই ১৯৪২ (১৬ আষাঢ় ১৩৪৯) তারিখ বুধবার কলকাতার ১০৫ সি পার্ক স্ট্রীটে ঢাকার বেগমের বাসায় মিসেস সরলা দেবী চৌধুরাণীর সভাপতিত্বে বেঙ্গল উইমেন্স কমিটির সভায় সাম্প্রদায়িক ঐক্য ফিরিয়ে আনার একটা কর্মসূচী নেওয়া হলো। এ দিনই কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ মার্কিন সাংবাদিক গ্রোভারকে বললেন : "ইংল্যান্ড হিন্দুদেরকে সন্তুষ্ট করার সুযোগ খুঁজছে এবং সেই অপেক্ষায় আছে।"

হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের টানাপোড়েনের পটভূমিকায় বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের মনোভঙ্গিটা লক্ষ্য করার মতো। এই পরিস্থিতিতে শীর্ষস্থানীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের কারো কারো কোনো কোনো কথা এবং কাজ কেবল মুসলিম লীগের মুসলিম সংগঠনকে নয়, মুসলিম সম্প্রদায়কে-ও নাজুক পরিস্থিতিতে ফেলেছিল।

৪ জুলাই ১৯৪২ তারিখ শনিবার বাংলার প্রধানমন্ত্রী শের-ই-বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক মুসলিম লীগ হাই কমান্ডের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ন্যাশনাল ডিফেন্স কাউন্সিলের মিটিং-এ যোগ দিতে দিল্লীর উদ্দেশে কলকাতা ত্যাগ করেন।

একটা ক্রান্তিলগ্নে, একটা তীব্র সঙ্কটময় মুহূর্তে মুসলিম নেতৃবৃন্দ, মুসলিম সংগঠন এবং সামগ্রিকভাবে মুসলিম সম্প্রদায় যে দ্বিধাবিভক্ত হ'য়ে দুর্বল হ'য়ে পড়ছে তার স্পষ্ট আলামত এটা।

www.pathagar.com

কলকাতার নিউ সিনেমায় নজরুল সঙ্গীত সমৃদ্ধ হিন্দী "চৌরঙ্গী" যেদিন মুক্তি পায় সেই ৫ জুলাই ১৯৪২ তারিখ রবিবার তামিল নাড়ু কংগ্রেস কমিটির বিধান পরিষদীয় দলের নেতা চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারীকে মুসলিম লীগের সঙ্গে সমঝোতার প্রয়াস চালানোর অভিযোগে কংগ্রেস হাই কমান্ডের তরফ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটীস দেওয়া হলো।

চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারীর এই পদক্ষেপ সামগ্রিকভাবে হিন্দু নেতৃবৃন্দের অনুমোদন পায় নি।

এ সময় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ চাইছিলেন বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা ভারত শাসনের ভার মুসলিম লীগ তথা মুসলিম সম্প্রদায়ের শরীকানাকে বাদ দিয়ে কেবল তাঁদেরই হাতে দিয়ে যাক। ১৯৪২-এর ৭ই এবং ৮ই জুলাই কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে গৃহীত 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর কী কী ঘটতে পারে সে অঙ্ক তো কষাই ছিলো। সেই হিসাব মতোই কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে ১৯৪২-এর ৮ জুলাই 'বুধবার ভারত ছাড়' প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর পরই ৯ জুলাই বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই সারা ভারতব্যাপী মুসলমানদের ওপর হিন্দুদের হামলা শুরু হলো। ৯ জুলাই ভোরে গান্ধী, নেহরু, আজাদ প্রমুখ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ গিরেফতার হলেন। গিরেফতারের খবর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নানাস্থানে হামলা, হত্যা, হুজ্জতি, লুঠ-পাট, রাহাজানি, অগ্নি-সংযোগ ইত্যাদি শুরু হলো। বিশেষত বিহার, যুক্ত প্রদেশ, বোম্বাই ও বাংলার মুসলমানদের জান-মালের ওপর হামলা সব চেয়ে ব্যাপক আকার ধারণ করে। এই সমস্ত জায়গায় ডাকঘর, থানা, রেল ভবন, আদালত ভবন ইত্যাদি সরকারি সম্পত্তিতে যেমন অগ্নি সংযোগ, লুঠ-পাট চালানো হয় এবং নানাস্থানে রেল লাইন উপড়ে ফেলা হয়, তেমনি মুসলমানদের দোকান ঘর লুঠ-পাট করা হয়, পুলিশের মুসলমান দারোগাদের, কন্সটেবলদের হত্যা করা হয়। জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। রেলের পুল, রাস্তা নষ্ট করা হয়। নানাস্থানে কিছু ইউরোপীয়কে-ও হত্যা করা হয়। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ এই পরিস্থিতি খুবই ঠান্ডা মাথায় মোকাবিলা করার চেষ্টা করেন। সমগ্র পরিস্থিতি শান্ত হতে প্রায় মাস দুয়েক সময় লেগেছিলো।

কবির আকস্মিক আঘাতজনিত অসুস্থতার তারিখ প্রসঙ্গে এই সব অবাঞ্ছিত ঘটনাগুলোর সময়টার কথা-ও ভালোমতো ইয়াদ রাখা দরকার।

কবির অসুস্থতা কখন দেখা দেয়, এ প্রশ্নের জবাবে শান্তিলতা দেবী বললেন : "মহালয়ার দিন।" মহালয়ার দিন অর্থাৎ ৯ অক্টোবর ১৯৪২ তারিখে। শান্তিলতা দেবী জানালেন : "ইতোপূর্বে কবি সপরিবারে মধুপুর গিয়েছিলেন। শরীরটা আগে থেকেই খারাপ ছিলো। ঘরেই থাকতেন। অফিসে বা অন্য কোথাও বাইরে যেতেন

www.pathagar.com

না। তখন-ও কবি ভুল বকতেন না। তখন তাঁর মাথা খারাপ হয়নি। তখন-ও উদাস ভাব দেখা দেয়নি। তবে শরীরটা খারাপ ছিল। কথাটা একটু জড়িয়ে গিয়েছিলো। এটা মহালয়ার বেশ কিছুদিন আগের ঘটনা।"

শান্তিলতা দেবীর দেওয়া বিবরণ:

"ঐ সময় থেকেই প্রথমে চিকিৎসা করছিলেন ডাক্তার ডি. এল. সরকার। বাড়ীওয়ালার ছেলে। যে তিনতলা বাড়ীটা ভাড়া নেওয়া হয়, বাড়ীওয়ালারা তার পাশের বাড়ীতে থাকতেন। তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করছিলেন। হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীই কবিকে মধুপুর পাঠান। শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী সন্ধ্যায় কবিকে বললেন, 'বাইরে চলে যান'। সন্ধ্যায় যাওয়া ঠিক হয়।" কালীপদ গুহ রায়ের ব্যবস্থাপনায় কবি সপরিবারে ভোরেই রওয়ানা হন। এ তথ্যটা-ও শান্তিলতা দেবীই দিলেন।

এরপর শান্তিলতা দেবীর দেওয়া বিবরণ :

"মধুপুরে ডাক্তার ডি. এল. সরকারদেরই একটা বাড়ী ছিলো। সেই বাড়ীতেই উঠেছিলেন কবি পরিবার। "মধুপুর যাওয়া প্রসঙ্গে শান্তিলতা দেবীর একটি উক্তি": "মধুপুর যাওয়ার আগে, মধুপুর থেকে আসার পরেও কবি বাড়ী থেকে বা'র হতেন না।"

এটা একটা মর্মান্তিক খবর। কবি যে বাইরে বের হ'তেন না, এটা কি কেবল তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কারণে? শারীরিক অসুস্থতা তো তাঁর ছিল। এই সঙ্গে সম্ভবত যোগ হ'য়েছিল বাইরের কিছু লোক জন সম্পর্কে, বাইরের এক শ্রেণীর লোক জনের আচরণ সম্পর্কে একটা মানসিক ভীতি বা শঙ্কা। বোঝা যায়, যে কোনো কারণে হোক, পরিবারের লোকজনদের কাছে কবি অনেক কিছুই বলতেন না বা পারতপক্ষে বলতেন না। শাশুড়ী শাসিত সংসারে কবির কর্ম-জীবন বা বাইরের জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ-খবর নেওয়ার পরিবেশটা-ও সম্ভবত প্রথম দিক থেকেই তৈরি হয় নি। কবির ব্যক্তি জীবনের একটা নিঃসঙ্গতার দিক এখানে স্পষ্টতই চোখে পড়ে। শাশুড়ীর ভূমিকাটা কর্তৃত্বের হওয়ার কারণে কবি ও কবি-পত্নীর সম্পর্কের মাঝখানে একটা পাঁচিল তৈরি হ'য়েছিল। সম্পর্কটা খারাপ না হ'লে-ও ঘনিষ্ঠতাটা যতখানি হ'তে পারতো ততখানি হ'তে পারে নি।

এ থেকে অনুমিত হয় ৯ জুলাই (১৯৪২) বা এর কাছাকাছি সময় থেকে কবির অসুস্থ হওয়ার কথাটা ঠিক। কিন্তু কবি পরিবারের কাছে এই অসুস্থতাটা তখন তেমন আশঙ্কাজনক মনে হয়নি। কেননা, কবি তখনও মানসিক দিক দিয়ে সুস্থ ছিলেন। কথায় একটু জড়তা দেখা দিয়েছিল। এবং বাড়ী থেকে বা'র হতেন না। এই সময় থেকেই এর মাস তিনেক পর মহালয়ার দিন পর্যন্ত কয়েকটি ঘটনা ঘটে।

www.pathagar.com

এক, প্রথমে বাড়ীওয়ালার ছেলে ডাক্তার ডি.এল.সরকার তাঁর চিকিৎসার ভার নিলেন। তিনি শুরু ক'রেছিলেন এবং চালিয়ে আসছিলেন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা।

দুই, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় খরচ দিয়ে কাজের লোক ঊষাসহ কবি পরিবারকে মধুপুর পাঠান।

তিন, মধুপুরেও কবি ডাক্তার ডি.এল.সরকারের আর একটা বাড়ী "গৌরাঙ্গ ভবন"-এ তারই চিকিৎসাধীনে থাকেন।

চার, মধুপুরে হাওয়া পরিবর্তনে গিয়ে ডাক্তার ডি.এল.সরকারের আর একটা বাড়ী "গৌরাঙ্গ ভবন"-এ তারই চিকিৎসাধীনে থেকে কবির স্বাস্থ্যের উন্নতি নয়, বরং অবনতিই ঘটেছিলো।

পাঁচ, কবি যখন মধুপুরে ছিলেন তখন "নবযুগ" থেকে তাঁর কাছে টাকা পাঠানো হতো এবং বাক্স করে ফল পাঠানো হতো। কলকাতার হ্যানিম্যানের দোকান থেকে প্রতি হপ্তায় তাঁর জন্য ওষুধ যেতো। নবযুগের টাকা কবি নিজে সই করে নিতে পারতেন।

ছয়, মধুপুরের পেঁপে খুব ভালো। পাকা পেঁপে পাওয়া যেতো খুব। কবি পাকা পেঁপে খেতেন। পাকা পেঁপে খাওয়ার দরুন কবির খুব কাশী হয়। কাশীটা দীর্ঘস্থায়ী হয়। শান্তিলতা দেবী বলেছেন, "তখন ওঁনার মাথা খারাপ হয়নি। কাশীটা বেড়ে গেলো। কলকাতায় এসে ডি. এল. সরকারকে বলা হলো। ডি. এল. সরকার তখন অন্য ডাক্তার দেখাতে বললেন। কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থকে আমাদেরই কে যেন ঠিক করলেন।

সাত, শান্তিলতা দেবী বলেছেন যে, "কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থের ওষুধ খাওয়ার পর মহালয়ার দিন (৯ অক্টোবর ১৯৪২) সকালে হঠাৎ কবির মাথা খারাপ হয়ে যায়। ভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে চন্ডী পাঠের পর 'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি' গানটি শোনার পর।" শান্তিলতা দেবী বললেন, "মহালয়ার দিন ভোরে চন্ডী পাঠ হয়। আমরা সবাই চন্ডী পাঠ শুনলাম। কবি-ও শুনলেন। চন্ডী পাঠ করেছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। চন্ডী পাঠের পর নজরুল ইসলামের লেখা গান হলো :'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি।' ঐ গানটি দিয়ে শেষ হয়। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর কবি অন্যান্য দিনের মতো কাগজ নিয়ে বাথরুমে গেলেন। এবং বাথরুম থেকে বারংবার বেরিয়ে আসতে লাগলেন।"

শান্তিলতা দেবীর দেওয়া এই বিবরণ খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করা দরকার। এগুলো বহুলাংশে দুষ্প্রাপ্য তথ্য। এ গুলোর মধ্যে চিন্তার অনেক খোরাক আছে। এ গুলির

www.pathagar.com

মানদণ্ডে প্রচলিত নজরুল জীবনী, নজরুল স্মৃতিকথার অনেক তথ্য-ই খতিয়ে দেখে পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে।

দাওয়াত ছিলো মহালয়ার দিন। কবি পরিবারের লোকেরা শান্তিলতা দেবীর মামার বাড়ীতে বালীগঞ্জ যাবেন। শান্তিলতা দেবী বললেন : "সব্যসাচী যেতে চাইলো না। কবি রাগ করলেন। বললেন যে, তাঁরা নিমন্ত্রণ করেছেন, যাওয়া উচিত।" শেষ পর্যন্ত অনিরুদ্ধ গেলো কবির শাশুড়ী গিরিবালা দেবীর সঙ্গে, সব্যসাচী গেলো না।"

লক্ষ্য করার মতো একটা তথ্য এখানে পাওয়া যাচ্ছে এবং তা এই যে, কবি এ সময়-ও তাঁর পারিবারিক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা ভূমিকা রাখছেন। তখন-ও নির্বাক, নিশ্চুপ বা নিষ্ক্রিয় হ'য়ে যান নি।

এ বিষয়ে শান্তিলতা দেবীর নিজের উক্তি : "বিমলানন্দ তর্কতীর্থের ওষুধ খাওয়ার দু'-তিন দিন পর মহালয়ার দিন কবির মাথাটা হঠাৎ একদিন খারাপ হয়। চন্ডী পাঠের পর 'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি' এই গানটি হয়ে অনুষ্ঠান শেষ হলো। গানটা শেষ হলেই কবি আমার মাকে বললেন, 'দিদি ওকে (আমার মেয়েকে) বাড়ী পাঠাবেন না।' এর পর কবি রোজকার নিয়ম মতো বাথরুমে গেলেন। বাথরুমে বারংবার যাচ্ছেন। মাথায় পানি ঢালছেন।

কবির শাশুড়ী এবং অনিরুদ্ধ আমার মামার বাড়ী গেলেন।"

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে চন্ডীপাঠের পর নজরুল ইসলামের গান 'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি', এই গান কেন? এটা নিশ্চয়ই সংগঠিত এবং সংঘঠিত কোনো ঘটনার ইঙ্গিতবহ। কলকাতা বেতার কেন্দ্রেই একটা আঘাত যে কবিকে করা হ'য়েছিল এটা কি তারই ইঙ্গিতবহ?

এদিনই প্রথম কবি কাউকে বকেছেন। শান্তিলতা দেবীর মামার বাড়ী সব্যসাচী যেতে চায়নি বলে কবি সকালে তাকে বকেছেন। ঐ মহালয়ার দিন সন্ধ্যায় সব্যসাচী ছাদে ছিল। কবি সন্ধ্যায় ছাদে গেলেন। তখন কবি-পত্নী শান্তিলতাকে ছাদে পাঠালেন দেখতে। এ বিষয়ে শান্তিলতা দেবীর উক্তি: "সব্যসাচীকে বকেছেন।

সব্যসাচী সন্ধ্যা বেলায় ছাদে ছিলো। কবি-ও সন্ধ্যা বেলায় ছাদে গেছেন। ছাদে গেলাম দেখতে। সন্ধ্যা বেলায় ছাদে গিয়ে দেখি ইজি চেয়ারে বসে কবি কারো সম্পর্কে নিজে নিজে বকছেন : "তুই ভূত হবি, তুই প্রেতাত্মা হবি'।"

কেউ যে কবিকে আঘাত ক'রেছিল, এটা কি তারই প্রমাণ নয়? সে যাই-ই হোক, শান্তিলতা দেবী ব'ললেন :

"সব্যসাচীকে কিছু বলেন নি — আমাকেও কিছু বলেননি।"

১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় একটা আকস্মিক শারীরিক

www.pathagar.com

আঘাত, যে আঘাত এসেছিল তাঁর পরিচিতজনদের কারো হাত দিয়েই, তাঁকে কেবল শারীরিক দিক দিয়েই আহত করে নি, আহত ক'রেছিল মানসিক দিক দিয়ে-ও।

রাতে সবাই শুতে যাওয়ার পর কী ঘটেছিলো সে কথা শান্তিলতা দেবী বললেন, : "ওপরেও বাথরুম ছিলো। কিন্তু জলের ভালো বন্দোবস্ত ছিলো না। এক তলার বাথরুমে সব সময় পানি থাকতো। রাত দশটা-এগারোটার সময় আমরা শুতে যাওয়ার পর কবি নিজে নিজে নীচের বাথরুমে গেলেন। রাতে, কবি বারংবার দোতলা থেকে এক তলার বাথরুমে গেছেন। অন্তত দশবার।

কবি-পত্নী (কাজের লোক) ঊষাকে বাথরুমে গিয়ে দেখতে বললেন। ঊষা গিয়ে দেখে কবি মাথার ওপর জল ঢালছেন। চান করছেন। এ রকম প্রায় দশবার কবি চান করলেন।"

এটা মহালয়ার পরের দিনের অর্থাৎ ১০ অক্টোবর ১৯৪২-এর কথা।

শান্তিলতা দেবীকে আমি বললাম, "এক জন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে, ১৯৪২ সালের ৯ই জুলাই কবি অল ইন্ডিয়া রেডিও'র কলকাতা কেন্দ্রে এক সন্ধ্যায় ছোটোদের আসরে কথা বলতে (টক্ দিতে) গিয়ে আর কথা বলতে পারছিলেন না। অসুখটা নাকি প্রথম তখনই ধরা পড়ে। সেই থেকেই নাকি কবি অসুস্থ।"

সুফী জুলফিকার হায়দারের স্মৃতিকথা থেকে এই ভ্রান্তি কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের "কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা"-য় আসার পর এটা ব্যাপ্তি পেয়েছে।

শান্তিলতা দেবী জানালেন যে, কথাটা ঠিক নয়। বললেন : "রেডিও-তে অনেক আগে ছোটদের আসরে বিকেল বেলায় কথা বলতে বলতে একটু আটকে গেলেন। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় গল্প দাদুর আসরে। অনুষ্ঠানটি ছিলো সন্ধ্যায় নয়, বিকেলে। ছোটদের আসরে আবৃত্তি করছিলেন কবি। কবির কথাটা একটু আটকে যাচ্ছিল। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন : "কবি ভেবেছেন এখন-ও তোমাদেরই মতো ছেলে মানুষ আছেন। কবি চশমা আনেননি তো! সে জন্য বলতে পারছেন না।"

শান্তিলতা দেবী বললেন, "আগেই (কবির) কথায় একটা জড়তা এসেছিলো।"

আমাদেরকে সব সময়ই মনে রাখতে হবে যে, কবির অসুস্থতার তারিখ-তথ্য সম্পর্কিত এই বিবরণগুলি কবির পালিত কন্যা শান্তিলতা দেবীর দেওয়া। শান্তিলতা দেবী তখন দীর্ঘদিন যাবৎ কবি-পরিবারেই থাকতেন।

শান্তিলতা দেবী বলতে চেয়েছেন, মহালয়ার দিনেই কবির প্রকৃত অসুস্থতার শুরু। ঐ দিনটি সম্পর্কে শান্তিলতা দেবী আরো জানালেন : "মহালয়ার দিনে কবি বল্‌লেন, কাপড়-চোপড় কিনে আনো। আমি আগে থেকেই ছাপা শাড়ী চেয়েছিলাম।

www.pathagar.com

কবি বলেছিলেন, দেবেন। কবি দেবতুল্য ছিলেন। আমার পিতার মতো ছিলেন। তিনি আমার পিতার অভাব বুঝতে দেননি। সেবার আমি প্রথম ছাপা শাড়ী পরি। কেনা কাপড় তিনি কয়েকবার দেখলেন।"

একজন বাঙালী নারীর কাছে এই শাড়ী স্মৃতি অনেক মূল্যবান, অনেক কিছুই। ভুল হওয়ার নয়। তাঁর কাছে একটা শাড়ীর গুরুত্ব অনেক বেশি হওয়ায় এই প্রসঙ্গে কবিকে তিনি দেবতুল্য ব'লেছেন। কবি দেবতুল্যই ছিলেন। কিন্তু তিনি সেটা স্মরণ ক'রেছেন এই প্রসঙ্গে। সেই মহালয়ার দিনের কেনা-কাটার স্মৃতিকথায় শান্তিলতা দেবী আরো ব'ললেন:

"কবি নতুন বালিশ দিতে বললেন। কলেজ স্ট্রীটের দোকান থেকে তাঁর জন্য নতুন বালিশ আনা হলো।

পরদিন বললেন : "আমাকে নতুন বালিশ দেওয়া হলো না।" বললেন : "গোলাপ জল আনো।' গোলাপ জল সারা ঘরময় সবার গায়ে ছিটিয়ে দিতে লাগলেন।"

কবির ভুল স্মরণ যে মহালয়ার দিন থেকে শুরু হ'য়েছে সে তথ্য কবির পালিত কন্যা শান্তিলতা দেবীর এই স্মৃতিকথায় পাচ্ছি।

লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালে পাঠানো সম্পর্কে শান্তিলতা দেবী বললেন: "নতুন বাড়ী দেখতে যাবো, এই কথা বলে কালীপদ গুহ রায়ের ব্যবস্থাক্রমে তাঁকে লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।" উঁনি বললেন, "বাড়ী দেখতে যাওয়ার কথা বলায় কবি আপত্তি করেন নি। উঁনি খুশী মনেই রওয়ানা হয়েছিলেন।"

তাঁর কথায় বোঝা গেলো, বাড়ী দেখার ব্যাপারে, বাড়ী ঠিক করার ব্যাপারে কবি পরিবারের অন্যান্যদের একটা হাত থাকতো।

শান্তিলতা দেবীর উক্তি এই যে, কবিকে মধুপুর পাঠানোর বন্দোবস্ত কালীপদ গুহরায় করেছিলেন। "চিকিৎসাদির ব্যবস্থা, কবির পাওনা টাকা পয়সা আদায়ের ব্যবস্থা, কবির পরিবারের লোকজনদের 'সাধ আহ্লাদ' মেটানোর ব্যবস্থা, কবিকে লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা ইত্যাদি সব কিছুই' কালিপদ গুহ রায় ক'রেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বারংবার প্রশ্ন করা সত্ত্বে-ও একটি ব্যাপারে তিনি বললেন, কবিকে সপরিবারে মধুপুর পাঠানোর সময় সুফী জুলফিকার হায়দার ছিলেন না। তবে লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালে পাঠানোর সময় সুফী জুলফিকার হায়দার ছিলেন কিনা তা বলতে পারেন না।

উঁনি বললেন, 'সুফী জুলফিকার হায়দার শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে আসেননি। মধুপুরে যেতে বলেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মধুপুর

www.pathagar.com

আসছি, সে সময় মধুপুরের স্টেশন মাস্টার রত্নেশ্বর মুখ্যোপাধ্যায় স্টেশনে আমাদেরকে বললেন : "আপনারা সেকেন্ড ক্লাস টিকিট হ'লে-ও ফার্স্ট ক্লাসে যান। কবি অনিচ্ছা সত্ত্বে-ও ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছেন। ট্রেনে পথিমধ্যে একজন চেকার উঠেছেন। কবি এমনিতেই ভয়ে ভয়ে ছিলেন। সেটা দেখে কবির মুখ শুকিয়ে গেছে। কবি তাঁর স্ত্রীকে টাকা বের করতে বল্‌লেন। কবির স্ত্রী আমাকে টাকা দিলেন কবির হাতে দেওয়ার জন্য। কবি টাকা দিতে যাবেন, এমন সময় চেকার হাত জোড় করলেন। হিন্দুস্থানী টি. টি. হাত জোড় করলেন। বললেন : "আমি আপনাকেই দেখতে এসেছি। কবি ভয়ে ভয়ে থাকলে-ও ঐ টি.টি. হাওড়া স্টেশন পার করে দেওয়া পর্য্যন্ত সঙ্গে ছিলেন।"

কবি কাজী নজরুল ইসলামের চরিত্রের নৈতিকতার একটা দিক, আত্মমর্যাদাবোধের একটা দিক, আত্মসম্মানবোধের একটা দিক-ও এই ঘটনা থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায়। এই সম্বিৎ, এই সচেতনতাটুকুর পরিচয় তিনি তখন-ও দিতে পারছিলেন। আর বাঙ্‌লাভাষী নন, উপমহাদেশের এমন অবাঙালী মানুষদের কাছে-ও কবি যে কতখানি শ্রদ্ধেয় ছিলেন, এই ঘটনা থেকে সেই প্রমাণটুকু-ও পাওয়া যায়। আর কবি যে ব্যক্তিগত জীবনে এতটুকু-ও উশৃঙ্খল ছিলেন না, দায়িত্ব-জ্ঞানহীন ছিলেন না, সে পরিচয় এ সময়-ও তো তিনি দিলেন।

ব্যবহারিক জীবনে কবি যথাসম্ভব নিয়ম নীতি মেনে চলতেন। শান্তিলতা দেবী বলেছেন : "কবি কোনো দিন জোরে কথা বলতেন না। বাসায় লোকজন খুবই আসতো। কবির শাশুড়ীর আত্মীয়-স্বজনরা বেশ আসা-যাওয়া করতেন। কবি লোকজনের সঙ্গে হোই হোই করে হাসা, মেলামেশা পছন্দ করতেন না। কবি যা পছন্দ করতেন না আমরা-ও তা করতাম না।"

নজরুল ব্যক্তিত্বের এই পরিচয় নিশ্চয়ই অনেকের কাল্পনিক ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটাবে। আমাদের নাগরিক চেতনার অভাব, আমাদের গ্রাম্য মানসিকতা, আমাদের অগভীর চিন্তা-চেতনা, ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়ে আমরা যে পড়াশুনা করি না, এই সব কিছুই কবির সৃষ্টিকে বুঝবার ক্ষেত্রে অন্তরায় হ'য়েছে। বিশেষত অগভীর পড়াশুনার কারণে নজরুল জীবন সম্পর্কে-ও আমরা অনেক ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতে অভ্যস্ত হ'য়েছি।

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম : "কবি কী রকম পরিবেশে পড়াশুনা, লেখালেখি করতেন?"

জবাবে তিনি বললেন : "তাস খেলা হচ্ছে, পাশে কবি লিখছেন। তাঁর পড়াশুনা, লেখালেখির জন্য আলাদা কোনো জায়গা ছিলো না, আলাদা কোনো ব্যবস্থা ছিলো না।"

www.pathagar.com

যাওয়ার টাকা দেন। মধুপুরে কবির দুই ছেলে, ঊষা (কাজের লোক), স্ত্রী, শাশুড়ী এবং আমি গিয়েছিলাম। বাড়ীতে তখন কোনো দারোয়ান ছিলো না।"

কবির আর্থিক অবস্থায় ভাঁটার টান কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছিল, এই তথ্য থেকে সেটা-ও সুস্পষ্ট জানা গেলো। যে বাসায় এক সময় দারোয়ান থাকতো এখন আর সেখানে দারোয়ান নেই।

শান্তিলতা দেবী বললেন : "লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালে বিজয় সেনগুপ্ত ছাড়া বাড়ীর আর কেউ দেখতে যাননি।"

বিজয় সেনগুপ্তের কাছ থেকেই তাঁরা খবর পেতেন। হসপিটালের গার্ড তাকে জানাতেন যে, সেখানে দিনকে দিন কবির স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছিল। শান্তিলতা দেবীর এই কথা থেকে মনে আসা স্বাভাবিক যে, কলকাতার শ্যামবাজার স্ট্রীট থেকে লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতাল দিল্লীর মতো কোনো দূরের জায়গা নয়। পঙ্গুত্বের কারণে কবি-পত্নীর সেখানে যাওয়া সহজ ছিল না, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এই অবস্থায় গিরিবালা দেবী কি একবার যেতে পারতেন না? সমস্ত দায়িত্বভার অর্পণ করা ছিল কালীপদ গুহরায়ের ওপর।

শান্তিলতা দেবীর উক্তি : "সেখানে চিকিৎসা ভালো হচ্ছিল না বলে ফিরিয়ে আনা হয়। কালীপদ গুহরায় ফিরিয়ে আনেন হাসপাতাল থেকে।"

রাঁচীর মানসিক হাসপাতালে কখন কোন্ পরিস্থিতিতে পাঠানো হ'য়েছিল সে কথা জানতে চাইলাম শান্তিলতা দেবীর কাছে। তিনি জবাব দিলেন : "রাঁচীতে পাঠানো হলো অনেক পরে। রাঁচীতে ইউরোপিয়ান হসপিটাল কটেজে কবির সাথে এক বছর আমার বড় মেয়ে ছিলো। ওখানে ভালো যত্ন হয়েছিলো।"

শান্তিলতা দেবী বললেন : "সপরিবারে কবিকে যখন মধুপুর পাঠানো হলো সে সময়ে কবির শুধু কথার জড়তা ছিলো।

কবি লুম্বিনী পার্কে গিয়েই (লুম্বিনী পার্কে থাকার সময়েই) কবির মাথা খারাপ হয়ে গেলো।"

শান্তিলতা দেবীর এই কথাটা-ও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য করার মতো।

শান্তিলতা দেবী সব কিছুই ব'লেছেন অত্যন্ত সহজ সরলভাবে।

মধুপুর থেকে ফেরার সময় যে কবির মানসিক সুস্থতা অটুট ছিলো সেটা শান্তিলতা দেবীর দেওয়া একটা বিবরণ থেকে বোঝা যায়। উঁনি বললেন : "মধুপুরে থাকতেও কবির স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটেনি। বরং খানিকটা অবনতিই ঘটেছিলো। মধুপুরের পেঁপে ভালো। কবি পাকা পেঁপে খেতেন। ঠান্ডা পেঁপে খেয়ে কবির কাশী হয় এবং তা উত্তরোত্তর বেড়ে যায়। মধুপুর থেকে যেবার অসুস্থ কবিকে নিয়ে চলে

www.pathagar.com

কবির ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই জানার আছে। নজরুল জীবন ও সৃষ্টির বিষয়ে সেভাবে জানার উদ্যোগ আজো নেওয়া হয় নি।

কাগজ পত্র সংরক্ষণ সংক্রান্ত একটি বিষয়ে জানার জন্য আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। বললাম : "জবাবে কবি যাঁদেরকে চিঠিপত্র লিখেছিলেন সে সব চিঠিপত্রের-ও কিছু কিছু পাওয়া গেছে। কিন্তু যে সব চিঠিপত্রের জবাবে কবি ঐ সব চিঠিপত্র লিখেছেন সেই চিঠিপত্র-ও (এক-আধটি ঐ সময় যা প্রকাশিত হয়েছিলো সেগুলো বাদ দিলে) কবি পরিবার থেকে পাওয়া গেলো না কেন? কবির বইয়ের বিভিন্ন সংস্করণ, পাণ্ডুলিপি, কবির লেখা প্রকাশিত হয়েছে এমন সব পত্র-পত্রিকা, কবির গানের গ্রামোফোন রেকর্ড, এ সবের-ও প্রায় কিছুই (অন্তত সিংহভাগটাই) কবি পরিবার থেকে পাওয়া গেলো না, এর কারণ কী?"

শান্তিলতা দেবী জানালেন : "কবির স্ত্রী প্যারালাইসিসে শয্যাশায়ী। এর ওপর কবি নিজে-ও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকেই তখন দেখাশুনা করতে হয়। এক দেখতাম আমি।"

দেখার কেউ ছিল না। অসুস্থ কবি। কেবল অসুস্থ নন, প্রায় নির্বাক, নিশ্চুপ তিনি তখন। কবি-পত্নীও প্যারালাইসিসে শয্যাশায়ী। অর্থনৈতিক ও অভিভাবকত্ব, এই উভয় দিক দিয়েই এক অসহায় পরিবার।

এভাবে তিনি বোঝাতে চাইলেন : রক্ষণাবেক্ষণ করার, সংরক্ষণ করার কেউ ছিলো না। যে যা পেরেছেন নিয়ে গেছেন। বাড়ীতে হেফাজত করার কেউ ছিলেন না। শান্তিলতা দেবী নিজে-ও অনেক কিছু নিয়ে গেছেন। এ প্রসঙ্গে শান্তিলতা দেবীর নিজেরই উক্তি: "আমার কাছে কত খাতা, কত চিঠি ছিলো। আমি তো ভাড়াটে বাড়ীতে থাকতাম। সে সব রাখতে পারিনি। এর মূল্য-ও বুঝিনি। বই-পত্র প্রচুর ছিলো। যে কেউ খুশী মতো নিয়ে যেতে পারতো। (১৯৮৭ থেকে) ছত্রিশ বছর আগে বজবজে মাস্টারী শুরু করি, সেখানে থাকতে যাই। চার বছর হলো রিটায়ার করেছি। আমার মা আমাকে বিয়ে দিয়ে বজবজে ঘর জামাই রেখেছিলেন।"

ছত্রিশ বছর আগে থেকে অর্থাৎ ১৯৫১ সাল থেকে বজবজে মাস্টারী ক'রেছেন শান্তিলতা দেবী।

কবির বইপত্র, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে শান্তিলতা দেবী বললেন : "খাতাপত্র অনেকের কাছে আছে। দেবে কিনা বলতে পারি না।' 'কবির আত্মীয়-স্বজনের কাছে লেখা চিঠি পত্র, ঠাট্টা করে লেখা চিঠিপত্র আছে। পাওয়া যাবে কিনা জানি না।"

www.pathagar.com

“আমার বালীগঞ্জ স্কুলের শিক্ষিকা বীণা সেনগুপ্ত অনেক খাতাপত্র তাঁর (কবির) স্ত্রীর কাছ থেকে নিয়ে যান। গোল পার্কের কাছে থাকতেন।”

এই জায়গাটা লক্ষ্য ক'রলে স্পষ্টত-ই উপলব্ধি করা যায়, কবির অবদানের গুরুত্ব কবি-পত্নী সেভাবে বুঝতে পারেন নি, যেভাবে বোঝা প্রয়োজন ছিল।

শান্তিলতা দেবী জানালেন : শিক্ষয়িত্রী বীণা সেনগুপ্তের কাছে দু'-একবার হাঁটাহাঁটি করে কিছু খাতাপত্র তিনি আদায় করেছিলেন। সবটা পারেন নি। শান্তিলতা দেবীর উক্তি :

“বীণা সেনগুপ্ত একজন টিচার। বালীগঞ্জের একটা স্কুলে। তাঁর কাছে অনেক খাতা। তিনি কিছু দিয়েছেন। তাঁর কাছে অনেক কিছু আছে। গোল পার্কের কাছে তাঁর বাড়ীতে খাতা আনতে দু'-একবার গিয়েছি।” বীণা সেনগুপ্তের পরিচয় দিলেন শান্তিলতা দেবী এভাবে :

“মাঝে আমার দশ বছর বয়সে আমাকে কবি পরিবার থেকে নিয়ে মা বিয়ে দেন। বিয়ের পর নাইন পর্যন্ত কবির বাড়ী থেকে পড়াশুনা করেছি। বীণা সেনগুপ্ত ছিলেন আমার টিচার।”

বোঝা যায়, শান্তিলতা দেবীর ওপর বীণা সেনগুপ্তের স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রভাব ছিল এবং তিনি ছিলেন শান্তিলতা দেবীর চেয়ে অনেক বেশী অভিজ্ঞ এবং সচেতন। তাই এই পাণ্ডুলিপিগুলোর অন্তত আর্থিক মূল্য শান্তিলতা দেবীদের চেয়ে তিনি অনেক বেশি বুঝেছিলেন।

শান্তিলতা দেবী আফসোস করে খোলাখুলি বললেন : “তখন এ সবের মূল্য বুঝিনি।”

যে কৈশোরটা বুঝতে শেখার বয়স, শান্তিলতা দেবীর সেই কৈশোরটা তো কবি পরিবারেই কেটেছে। এ থেকে বোঝা যায়, কবির অবদান বোঝার মতো এবং বোঝানোর মতো পরিবেশ কবি পরিবারে ছিল না। এ এক মর্মান্তিক বাস্তবতা।

মূল্য কবির শাশুড়ী-ও বোঝেননি। কবি-পত্নীও বোঝেননি। শান্তিলতা দেবীর উক্তি মোতাবেক বীণা সেনগুপ্ত কবির খাতাপত্র নিয়ে গিয়েছিলেন কবি-পত্নীর কাছ থেকেই।

পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়ার আগে রান্না-বান্না ইত্যাদি ঘর-সংসারের কাজ কবি-পত্নী ঠিকই ক'রেছেন, কিন্তু কবির প্রতিভা, কবির অবদানকে বুঝবার মতো শিক্ষা-দীক্ষা এবং সাংস্কৃতিক চেতনা, মানসিক প্রস্তুতি, তাঁর-ও ছিল না। কবির সৃষ্টি যে কেবল রুজি-রোজগারের প্রয়োজন মেটানোর মধ্য দিয়ে শেষ হ'য়ে যায় নি, এই দূরদর্শিতা তাঁর-ও ছিল না।

www.pathagar.com

সংসার জীবন যাপনের এই ভাগ্য নিয়েই কবি সংসার করেছেন। এঁরা কবির কর্মজীবন, স্রষ্টা জীবন সম্পর্কে, ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে বিশেষ খোঁজ খবর রাখার চেষ্টা করতেন বলে মনে হয় না। এখানে-ও ছিলেন কবি প্রায় পুরোপুরিই একাকী, নিঃসঙ্গ। কিন্তু সংসারের ভার বহনে কোনো কার্পণ্য তিনি করেন নি। কবি তাঁর এই দাম্পত্য জীবন এবং সাংসারিক পরিবেশটাকে নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন। তাঁর একাকীত্বের, নিঃসঙ্গতার বিশাল শূন্যস্থানটিকেই এক সময় শনাক্ত ক'রে দিয়েছিলেন বিদুষী মিস্ ফজিলাতুন্নেসা। কিন্তু এই জায়গাটায় অন্তরায় সৃষ্টি ক'রেছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন প্রমুখ তাঁর নিকট জনেরা-ও। কারণ, কবির চিন্তা-চেতনার স্তর এঁদের থেকে অনেক উঁচুতে ছিল। কবি মিস্ ফজিলাতুন্নেসাকে লেখা তাঁর যে ব্যক্তিগত চিঠিগুলো এক সময় বন্ধু কাজী মোতাহার হোসেনের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিতে পেরেছেন ব'লে মনে ক'রেছিলেন সেগুলি কবি নির্বাক নিশ্চুপ হ'য়ে যাওয়ার পর কাজী মোতাহার হোসেনের পরিবার-পরিজনদের কাছেই পাওয়া গিয়েছিল। সেগুলি পরে গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হ'য়েছে। আর মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন সাহেব তো ফজিলাতুন্নেসাকে বিলেতে পার ক'রে দেওয়ার ব্যাপারে কাজ করলেন। দু'জনকে এক সঙ্গে রেখে গঠনমূলক কিছু করার কথা তাঁরা কেউ ভাবেন নি।

শান্তিলতা দেবী বলেছেন, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নড়তে তাঁর পাঁচ মিনিট সময় লাগতো, এমন ধীরস্থির, শান্ত স্বভাবের বিনম্র প্রমীলা (আশালতা সেনগুপ্তা) কবির পত্নী ছিলেন। পতিব্রতা এই নারী মুখ বুঁজে সংসার করেছেন, কিন্তু সাহিত্য ও সঙ্গীত স্রষ্টা নজরুলকে মানসিক সান্নিধ্য দেওয়ার মতো চিন্তা-ভাবনা তাঁর বোধ হয় তেমন ছিলো না। এর জন্য যে শিক্ষা, সাংস্কৃতিক বোধ এবং সর্বোপরি যে মানসিক প্রস্তুতির দরকার হয় সেটাও বোধ হয় তিনি যথেষ্ট অর্জন করার সুযোগ পান নি। কেননা, কবির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ এবং পরে বিয়ে যখন হয়েছিলো তখন তিনি নিছক স্কুলেপড়া বয়ঃসন্ধির সময়কার এক কিশোরী। তদুপরি বিয়ের পর সংসার জীবনে যখন তিনি এলেন তখন সঙ্গে তাঁর মা গিরিবালা দেবী-ও এলেন। ফলে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করার মতো সংসারের সর্বময় কর্ত্রী তিনি যেমন হওয়ার সুযোগ পাননি, ঠিক তেমনি ঐ একই কারণে স্বামীর ঐতিহ্য, বিশ্বাস, চিন্তা-ধারার সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন নি। এ বিষয়ে যথেষ্ট আদান-প্রদানেরও বোধ হয় সুযোগ হয় নি। কবির অনুভূতির, উপলব্ধির যথেষ্ট শরীক হওয়া-ও বোধহয় তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কবির নিকট সান্নিধ্য থেকেও সর্ব বিষয়ে তিনি যে খুব অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পেরেছিলেন এমনটা-ও মনে হয় না। এ বিষয়ে আরো একটা বড় অন্তরায়ও যে ছিলো, সেটা-ও এই একই সঙ্গে স্বীকার করা দরকার। সেটা মূলত নার্গিস স্মৃতি। কবি যে নার্গিস

www.pathagar.com

আসার খানমকে ভুলতে পারেন নি, স্বাভাবিকভাবেই তা প্রমীলা নজরুল ইসলামের টের না পাওয়ার মতো ছিলো না। এরপর কবির তরফে মিস্ ফজিলাতুন্নেসার মানসিক সান্নিধ্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, ব্যাকুলতা সে সময়ে নার্গিসকে না পাওয়ারই যে জের, এটা উপলব্ধি করা-ও কবি পত্নীর পক্ষে খুব কঠিন হওয়ার কথা নয়। তাছাড়া কবি-পত্নীর এ রকম পড়াশুনা এবং অভিজ্ঞতা ছিল না যে, ফজিলাতুন্নেসার মতো তিনি কবিকে অনেকখানিই মানসিক সান্নিধ্য দিতে পারেন। এই বিদুষীর প্রতি এক অমর্ত্য প্রেম কবিকে এক সময় তন্ময় করে তুলেছিলো। তবে এটিও ঠিক যে, গিরিবালা দেবী তাঁর 'নুরু'-কে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন বলেই সমাজের প্রবল চাপ, বিরোধিতা সত্ত্বে-ও তাঁর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। এ জন্য অন্তত সাময়িকভাবে হলে-ও তিনি অনেকখানি সমাজচ্যুত হয়েছিলেন। সম্ভবত এটাকে একটা ভ্রান্তি মনে করে পরে এরই মাশুল তিনি দু'ভাবে দিতে চেয়েছিলেন। এক, কবি পরিবারে তাঁর স্বধর্মী আত্মীয়-পরিজনদের আপ্যায়ন, আশ্রয় অবাধ করতে চেয়েছিলেন। দুই, কবি পরিবারে থেকেই নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবার জীবন যাপনকে নিশ্চিত করেছিলেন। এর ফলে আপাতদৃষ্টিতে এক ঘরে দুই প্রাচীর হয়তো ওঠেনি ঠিক-ই, কিন্তু এর মাঝখানে থেকে-ও মানসিক দিক দিয়ে সৌজন্যপরায়ণ, সংস্কৃতি-মনস্ক কবি তাঁর অন্তর জগতে অনেকখানি নিঃসঙ্গ, একাকী হয়ে গিয়েছিলেন। পরিবারে কবি-পত্নীর মা অন্য সংস্কৃতি অনুশীলন করায় কবির নিজস্ব সাংস্কৃতিক জীবন যাপনের অবকাশ সেখানে থাকার কথা নয়। এই অবস্থাটা কবিকে তাঁর নিজস্ব সাংস্কৃতিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়েছিল।

শান্তিলতা দেবী তাঁর বালিকা বয়স থেকে কবি পরিবারে ছিলেন বস্তুত একজন পালিত কন্যা হিসাবেই। কবি তাঁকে 'খুকি' বলতেন এবং যতদিন বেঁচে ছিলেন তাঁকে পালিত কন্যা হিসাবেই দেখেছেন। আদত পিতার অভাব তাঁকে বুঝতে দেন নি। অনুরূপভাবে খুকু-ও তাঁর পালক পিতাকে শ্রদ্ধা করেছেন। কিন্তু তা আর পাঁচজনের মতো নিছক বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গিতে, স্রেফ সাংসারিক দৃষ্টিতেই। সাহিত্য ও সঙ্গীত স্রষ্টা নজরুলকে দেখবার, বুঝবার, উপলব্ধি করার মানসিক প্রস্তুতি তাঁর ছিলো না। সে সুযোগ-ও তাঁর কোনো দিনই হয়নি। আমি যে সময় তাঁর সাক্ষাৎকার নিই, সেই সময় পর্যন্ত।

সংসারের একজন মানুষের চিন্তা-চেতনার স্তরের সঙ্গে যদি অন্যান্য সদস্যদের চিন্তা-চেতনার মিল না হয় তা হ'লে যে সমস্যাটা হয়, সে সমস্যাটা কবি পরিবারে ছিল। এবং এটাই পারিবারিক জীবনে কবিকে ক্রমে একটা সর্বগ্রাসী নিঃসঙ্গতা দিয়েছিল।

www.pathagar.com

নজরুলের দুর্ভাগ্যটা ঠিক এখানেই। বৈবাহিক জীবনে, সাংসারিক জীবনে রবীন্দ্রনাথের মতো সংস্কৃতিমনস্ক পরিবার তিনি পাননি। অনুরূপভাবে কর্মজীবনে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন, বিশেষত স্বধর্মী এক বিশাল বুদ্ধিজীবী সমাজ। কিন্তু নজরুল পড়েছিলেন হয়তো অনেকখানি বাধ্য হয়েই মূলত ব্যবসায়ীদের এবং ব্যবসায়ী মনোভাবাপন্ন লোকদের খপ্পরে। এই উভয় প্রতিবন্ধকতার কথা স্মরণে রেখে নজরুল প্রতিভা, ব্যক্তি নজরুলকে বিচার করতে হবে। নজরুল যা হয়েছেন তা কেবল এক অপ্রতিরোধ্য সুবিশাল ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার জোরেই। শান্তিলতা দেবী কবিকে পিতৃতুল্য মনে করতেন, দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। কিন্তু সাহিত্য ও সঙ্গীত স্রষ্টা নজরুল সম্পর্কে, কবির ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে বিশদ খোঁজ খবর নেওয়ার গরজ তিনি যে বোধ করতেন, এমনটা মনে হয় না। শান্তিলতা দেবীর নিজেরই উক্তি : "ওঁনার কাছে বাবার স্নেহ পেয়েছি। ওঁনাকে দেবতা মনে করতাম। উঁনি বলতেন, 'আমার যেখানে বাড়ী হবে, সেখানে আমার খুকীর-ও বাড়ী হবে।' সেদিন মাজারে গিয়ে আমার সেই কথাই মনে হয়েছে।"

এখানে স্পষ্টতই লক্ষ্য করা যায় যে, পার্থিব উপকরণের বাসনা চরিতার্থ করার মানদন্ডেই শান্তিলতা দেবীরা নজরুলের মূল্যায়ন করেছেন। কবি নজরুলের নয়। নজরুলের কর্ম-জীবন, তাঁর সৃজনশীল জীবনকে তারা স্পষ্টতই রুজি-রোজগারের মানদন্ডে দেখতে চেয়েছেন। এ কারণেই কবি অসুস্থ হ'য়ে পড়ার পর তাঁর পাণ্ডুলিপি, বই-পত্র, চিঠি-পত্র, গ্রামোফোন রেকর্ড ইত্যাদি সব কিছুই তাদের কাছে মূল্যহীন ব'লে পরিগণিত হ'য়েছে। এর পেছনে কাজ ক'রেছে কেবল শিক্ষা-দীক্ষার অনুন্নত স্তর নয়, ভিন্ন মেরুর সাংস্কৃতিক চেতনাটা-ও। আর এটা সামগ্রিকভাবে খতিয়ে দেখার ক্ষমতা বাংলা-ভাষী মুসলমানদের পিছিয়ে পড়া এই সমাজটারও ছিল না। সমস্যাটা গভীরভাবে উপলব্ধি করার কোনো গরজ-ও তারা বোধ করেন নি।

এটা শান্তিলতা দেবীর অর্থনৈতিক প্রয়োজনের কথা যে, কবি সুস্থ থাকলে তাকে একটা বাড়ি ক'রে দিতেন। কিন্তু কবির রচনাদি সংরক্ষণের কথা তাঁর কখনোই মনে হয়নি। আর এসবের যে এত আর্থিক মূল্য হবে সেটা-ও তিনি তখন বোঝেন নি। তাঁর কাছে এখন-ও কবির লেখা খাতা-পত্র, বই, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি কী কী আছে, এসব প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান : "খুঁজে দেখতে হবে।"

বোঝা যায়, পালিত কন্যা কোনো সুশিক্ষিত সংস্কৃতিবান কন্যা হ'য়ে ওঠেন নি। সে শিক্ষা-ও তিনি পারিবারিক পরিবেশ থেকে পান নি।

www.pathagar.com

শান্তিলতা দেবীর উক্তি : "মোটা মোটা খাতা, কত লেখা আমার কাছে কত ছিল; ভবিষ্যতে কাজে লাগবে সেটা ভাবতে-ও পারিনি। বজবজের বাসায় অনেক কিছু ছিলো। ছত্রিশ বছর বজবজে চাকরি করি। তারপরে রিটায়ার্ড। দেড় বছর আগে পেনশন পাই। মা ঘরজামাই রেখেছিলেন। মা বজবজে থাকতেন। খাতাটাতা হেফাজত করার কেউ ছিলো না বাড়ীতে। অনেক গানের খাতা, চিঠিপত্র আমার কাছে ছিলো। গ্রামোফোন রেকর্ড টেকর্ড কিছু নেই। এখন বলবো কী? অনেকের কাছে থাকতে পারে। তারা দেবে কি?"

এখানে-ও স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, কবির সৃষ্টি অনুসন্ধান, উদ্ধার ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর উদ্যোগ নেই, উদ্বেগ নেই, উৎকণ্ঠা-ও নেই। এটা হ'য়েছে মূলত তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার অভাবের কারণে। নজরুল ইসলামকে তাঁরা একজন উপার্জনক্ষম, সহানুভূতিশীল ভালো মানুষ হিসাবে দেখেছেন। কবি হিসাবে দেখেন নি। তাঁর সৃষ্টির আর্থিক মূল্য ছাড়া অন্য কোনো মূল্য-ও তাদের কাছে নেই।

তবে কবির বাড়ী থেকে খাতাপত্র, চিঠিপত্র কিছু নিয়ে গেলে-ও কবির গানের গ্রামোফোন রেকর্ড যে তিনি নিয়ে যান নি, তাঁর কথা থেকে সেটা বোঝা যায়।

এর একটা কারণ বোধ হয় এই যে, খাতাপত্রগুলো যতখানি অনায়াসে বহনযোগ্য, গ্রামোফোন রেকর্ডগুলো ততখানি নয়।

আসলে বস্তু-মনস্ক, গৃহমনস্ক হওয়া এক ব্যাপার, আর সংস্কৃতিমনস্ক হওয়া সম্পূর্ণ আলাদা কথা। তাঁর কথাতেই মনে হয়, কবি-পত্নী এবং কবির শাশুড়ীর কাছ থেকে-ও কবির সৃষ্টি সম্পর্কে তেমন দরদী হওয়ার, সচেতন হওয়ার কোনো তালিম তিনি পান নি। কবি পরিবারের চরম আর্থিক দুর্দিনে কবির সৃষ্টি থেকে তেমন পয়সাও এক সময় আর আসেনি। কবির রচনাদি সম্পর্কে উদাসীন হওয়ার এটাও সম্ভবত একটা বড় কারণ। তখন হয়তো মনে হয়ে থাকবে যে, রোজগার করার লোকটা যখন অচল তখন সবই তো শেষ হ'য়ে গেলো। এসব দিয়ে আর কীই-বা হবে! কবি অপরিসীম প্রতিভার অধিকারী না হলে এহেন পরিবারের কর্ণধার হয়ে তেমন বেশী কিছু, মহৎ কিছু দিয়ে যেতে পারতেন না। কবির নিঃসঙ্গতার, একাকীত্বের একটা ব্যাখ্যা এখানে-ও আছে। এবং সেটা স্পষ্টতই এই যে, কবিকে মানসিক সান্নিধ্য দেওয়ার মতো কেউ তাঁর আপন পরিবারে ছিলেন না। এই বিচ্ছিন্নতা এবং ব্যবধান কবি এবং কবি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যকার সাংস্কৃতিক ভিন্নতার কারণে ততখানি নয়, যতখানি এই উভয় পক্ষের অন্তবর্তী শিক্ষা-দীক্ষার ভিন্নতার কারণে।

লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতলে নিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বললেন : "যেদিন বাড়ী থেকে নিয়ে যাওয়া হয়, কী বলে নিয়ে যাওয়া হয়? নতুন বাড়ী দেখতে যাবো বলে।"

www.pathagar.com

এই বক্তব্য থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, কবির মানসিক সুস্থতা তখন-ও ছিল এবং তাঁর এই অবস্থায় তাঁকে স্রেফ ধোঁকা দেওয়া হ'য়েছে। শত্রুতামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে স্পষ্টতই প্রতারণা করা হ'য়েছে।

ওনার উক্তি : "লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালে পাঠানোর বন্দোবস্তটা দৈনিক 'নবযুগ'-এর অন্যতম সহকারী সম্পাদক এবং ম্যাট্রিকের খাতা দেখার ব্যাপারে সে সময় কবির অন্যতম সহকারী কালীপদ গুহরায়ই ক'রেছিলেন। তখন তাঁর নিজের বাড়ীতে তাঁর স্বীয় পুত্র-কন্যা থাকা সত্ত্বে-ও তিনি, (যে-কোনো কারণে হোক), কবি পরিবারেই থাকতেন। কিন্তু কবি অসুস্থ হওয়ার পর থেকেই কবির "বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াতেন না।"

শান্তিলতা দেবী অবশ্য এর কারণ ব্যাখ্যা করেন নি। তবে এটা বলেছেন যে, কবির সংসারের এবং কবির চিকিৎসাদির ব্যাপারে, মায় কবির দুই পুত্রের এবং কবির পালিত কন্যার সখ, আহ্লাদ মেটানোর ব্যাপারে-ও সবকিছুই করছিলেন কালীপদ গুহ রায়।

কবি পরিবারের এভাবে কালীপদ গুহ রায়ের থাকার ব্যাপারটা এবং কবি অসুস্থ হওয়ার পর তাঁর বাড়ীর চৌকাঠ না মাড়ানোর ব্যাপারটা স্পষ্টতই রহস্যজনক। আর এ সব বুঝবার ইচ্ছা বা মানসিকতা, কোনোটাই কি কবি-পরিবারের ছিল?

লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালে পাঠানোর সময় সুফী জুলফিকার হায়দার ছিলেন কি-না, এ প্রশ্নের জবাবে শান্তিলতা দেবী জানালেন যে, তিনি বলতে পারেন না। বললেন : "সে সময় বাড়ীতে সবাই কান্নাকাটি করছিলেন। — তখন আমাদের মধ্যে আমরা ছিলাম না।"

তাঁরা তাঁদের নিজের মধ্যে হয়তো ছিলেন না ঠিকই। কিন্তু কী ঘটছে, কীভাবে ঘটছে, এ সবের মধ্যে-ই-বা তাঁরা কতখানি ছিলেন?

প্রসঙ্গত বললেন : "সুফী জুলফিকার হায়দার প্রায়ই আসতেন। তবে টাকা-পয়সা তিনি কখনো সখনো উপযাচক হয়েই দিতেন। আমরা চাইতাম না।"

তাঁর বক্তব্য : "সেই দুর্দিনে কবি পরিবারকে বাঁচিয়েছিলেন কালীপদ গুহ রায়।"

এক জায়গায় তিনি আক্ষেপ করে বললেন, "আমার কোনো স্মৃতিকথা কখনো প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু কাকাবাবু কালীপদ গুহ রায়ের কথা কেনো লেখেন না? কালীপদ গুহ রায় না থাকলে কবি, কবি পরিবার বাঁচতে পারতেন না। কাকা বাবু ছিলেন বলে কবির ফ্যামিলিটা তখন বেঁচে গেছে।"

প্রসঙ্গত এ-কথাটা তাদের মনে পড়ে না যে, কালীপদ গুহ রায় নিজেই যখন একজন সাংবাদিক ছিলেন তখন তাঁর স্মৃতিকথা তিনি নিজে কেন লিখে গেলেন না?

www.pathagar.com

শান্তিলতা দেবীর কাছেই শুনলাম, "কবির অসুস্থতার পর কালীপদ গুহ রায় একটা ব্যাংক করেছিলেন। সেই ব্যাংকের সব টাকা এনে তিনি কবি এবং কবি পরিবারের জন্য ব্যয় করেছেন। আমাদের সমস্ত সাধ-আহ্লাদ মিটিয়েছেন।"

কেন মিটিয়েছেন? কীভাবে মিটিয়েছেন? আবার শেষ দিকে অসুস্থ কবির সম্বিত থাকা পর্যন্ত তিনি বাড়ির চৌকাঠই-বা মাড়াতেন না কেন? কবির কাছে তিনি কি কোনো অপরাধ ক'রেছিলেন?

এককালে কবির সারথ্যে প্রকাশিত হয়েছিল যে 'ধূমকেতু' তার ম্যানেজার শান্তিপদ সিংহের নাম-ও এলো এ প্রসঙ্গে। কালীপদ গুহ রায়ের ব্যাংকে শান্তিপদ সিংহ-ও টাকা রেখেছিলেন। কালীপদ গুহ রায়ের ব্যাংক লাল বাতি জ্বাললে শান্তিপদ সিংহের টাকাটাও মার খায়। শান্তিপদ সিংহ কবি পরিবারে এসে কালীপদ গুহ রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেন। তাঁকে জালিয়াৎ, চিটিংবাজ বলে নিন্দামন্দ করতেন। কালীপদ গুহরায়ের প্রতি অন্ধ পক্ষপাতিত্ব ও আনুগত্যের কারণে কবি পরিবার-ও এ বিষয়ে শান্তিপদ সিংহের ওপর নাখোশ হতেন। শান্তিলতা দেবীর নিজের ভাষায়:

"ওঁনার (কালীপদ গুহ রায়ের) বন্ধু শান্তিপদ সিংহ মাঝে মাঝে আসতেন। কালীপদ বাবুর দুর্নাম করতেন। কবির অসুস্থতার পর কালীপদ গুহ রায় ব্যাংক করেছিলেন। সেই ব্যাংকে শান্তিপদ সিংহের-ও টাকা ছিল। কাকা বাবু ব্যাংকের সমস্ত টাকাই আমাদের জন্য খরচ করেছেন। ওঁর (শান্তিপদ সিংহের) টাকাটা-ও নষ্ট করেছেন। উনি কাকা বাবুকে বলতেন চিটিংবাজ। আমি একদিন বললাম : "ওঁর কথা আপনি এ বাড়ীতে বসে বলবেন না। উঁনি তো অনেকেরই টাকা নষ্ট করেছেন। উঁনি আমাদের জন্যই করতেন।"

শান্তিলতা দেবীর উক্তি মোতাবেক জানা যায় যে, কবির অবস্থা উদ্দাম হয়ে উঠলে এই কালীপদ গুহ রায়ই কবিকে লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালে পাঠানোর বন্দোবস্ত করেছিলেন। ইতোপূর্বে কবিকে সংযত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বাড়ীতে এক একজন গার্ড রেখেছিলেন। কবির চিকিৎসাদির বন্দোবস্ত-ও তিনিই করতেন। নিজে কবির সামনে আসতেন না। কবির ঘরের চৌকাঠ মাড়াতেন না। কিন্তু কবির অসুস্থতার পর কবি পরিবারকে বাঁচানোর দায়-দায়িত্ব এসে গিয়েছিল বস্তুত তাঁরই হাতে।

কিন্তু এই অবস্থায় তিনি কবির বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াতেন না কেন? এই অবস্থায় তিনি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করলেন কীভাবে? ব্যাঙ্কে যাঁরা টাকা জমা রেখেছিলেন তাঁদের টাকা মারার মধ্যে তাঁর চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্যটা বেরিয়ে আসছে? কবির বাড়ীর চৌকাঠ যিনি মাড়ান না, তিনি কবিকে লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতাল তথা পাগলা গারদে পাঠাতে যান কেন?

www.pathagar.com

লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালে একমাত্র বিজয় সেনগুপ্ত ছাড়া কবি পরিবার থেকে আর কেউ কখনোই দেখতে যেতেন না। এই বিজয় সেনগুপ্তের হাতে কবির জন্য তাঁর পরিবার পাঠাতেন ঠান্ডা তেল, আমলা তেল। শান্তিলতা দেবীর উক্তি : "আমলা তেল, জবা কুসুম, ডাবের জল কিনে দেওয়া হতো। এটা ওটা পাঠানো হতো। আমার ভাই বিজয় সেনগুপ্তকে মাঝে মাঝে পাঠানো হতো। বিজয় সেনগুপ্ত ওয়ার্ড বয়ের সঙ্গে কথা বলে আসতো।"

কোন স্তরে যোগাযোগ ক'রে কবি পরিবার খবর সংগ্রহ করতেন সেটা-ও ভাববার মতো। বাইরের অজস্র নজরুল ভক্তরা কিন্তু কবির এই অসহায় অবস্থাটার কথা জানতেন না।

কবিকে সেখানে একটি বদ্ধ সেল-এ বিনা চিকিৎসায় নোংরা পরিবেশে আটকে রাখা হোতো। চিকিৎসা যে হয় না, নোংরা পরিবেশে আটকে রাখা হয়, দিনকে দিন কবির অবস্থার যে অবনতি ঘটছে, এসব কথা কবি পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা শুনতেন বিজয় সেনগুপ্তের কাছ থেকেই। বিজয় সেনগুপ্ত অনেক কিছু জানতে পারতো ঐ লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালের ওয়ার্ড বয়ের কাছে থেকে। ওখানে কবির চিকিৎসা হচ্ছে না, এ খবর বিজয়সেনগুপ্তের কাছে শুনে কবিকে তাঁর পরিবারের সদস্যরা বাড়ীতে ফিরিয়ে আনেন। বিজয় সেনগুপ্ত (খোকা) এর অল্প কিছু দিন পর অকালে মারা যান। তিনি বেঁচে থাকলে তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছুই জানা যেতো। তাঁর মৃত্যুটাই-বা তখন কতখানি স্বাভাবিক ঘটনা ছিল?
এই সময়কার ঘটনাবলীর অনেক কিছুই আমাদের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেছে। শান্তিলতা দেবী বললেন : "লুম্বিনী পার্কে গিয়েই কবি বেশি অসুস্থ হয়ে গেলেন।"

নজরুল জীবনীকাররা শান্তিলতা দেবীর স্মৃতিকথা থেকে কেবল যে নজরুল জীবনীর বহু উপাদান পাবেন, কেবল তাই-ই নয়, নজরুল জীবনীর অজস্র উপাদান সংগ্রহের অনেকগুলি উৎসমুখ-ও খুঁজে পাবেন।

শান্তিলতা দেবী এক সময় বললেন : "লুম্বিনী পার্কে একজন ব্যবসায়ী দেখা করতে গেলেন।" তিনি হেমেন দত্ত। শের-ই-বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক প্রতিষ্ঠিত দৈনিক "নবযুগ"-এর অন্যতম স্বত্বাধিকারী এবং শেষ দিককার মালিক এই ভদ্রলোক। হেমেন বাবু লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালে কবির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগে কবি পরিবারে দেখা করে গেলেন।

হেমেন দত্ত তখন শেষ পর্যায়ের দৈনিক 'নবযুগ'-এর মালিক। দৈনিক 'নবযুগ'-এর মালিকানা এখন আর শের-ই-বাংলা ফজলুল হকের নেই। তাঁর বক্তব্য যে, তিনি টাকা দিতে পারছেন না কবির দস্তখত পাওয়া যাচ্ছে না ব'লে। কবির সংসারে তখন কিন্তু অভাব।

www.pathagar.com

এ বিষয়ে শান্তিলতা দেবীর উক্তি : "ওঁনাকে বলে দিলাম : কবির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সংসারের অভাব-অভিযোগের কথা যেন কিছু না বলেন।" এরপর শান্তিলতা দেবীর উক্তি : "নবযুগের টাকাটা দেওয়ার ব্যাপারে কথা বলতে হেম বাবুকে কবি বললেন, 'আমি এখানে পড়ে আছি। আমার ছেলে মেয়ে খেতে পায় না।' কবি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : 'হেম বাবু, আপনি টাকা-পয়সা দেন তো?'

হেম বাবু বললেন, 'আপনার সই না হলে টাকা দিই কী করে?'

বাড়ীতে এসে বললেন : 'আমি ব্রাহ্মণ। টাকা দিইনি সেটা জানিয়ে দিই। আমি মিথ্যা কথা বলতে পারি না।"

নিজ পরিবারের সদস্যদেরকে ভালো অবস্থায় রাখার ব্যাপারে কবি যে কতখানি দায়িত্ব সচেতন এবং সংবেদনশীল ছিলেন সে পরিচয়-ও শান্তিলতা দেবীর সাক্ষাৎকারে পাওয়া যায়।

কবির সইয়ের অভাবের দরুন দৈনিক 'নবযুগ'-এর বেতন যে কবি পরিবারকে দেওয়া হয় না, দৈনিক 'নবযুগ'-এর স্বত্বাধিকারী হেমেন দত্ত সে কথাই না-কি সেদিন কবিকে বলেছিলেন। আর এ কথা শুনেই না-কি কবির মাথা খারাপ হয়ে যায়। পরিবারের অর্থনৈতিক সমস্যার কথা চিন্তা করেই না-কি কবির আর একবার মাথা খারাপ হয়ে গেলো।

এর আগে শান্তিলতা দেবী বলেছিলেন যে, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থের ওষুধ খাওয়ার দু'-তিন দিন পর মহালয়ার দিন কবির মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। শান্তিলতা দেবী বলেছিলেন, কবি পরে তাঁর পক্ষে স্ত্রীকে সমস্ত বিষয়ে টাকা তোলার জন্য অথরাইজড লেটার দেওয়ার পর কবির দৈনিক 'নবযুগ'-এর বেতন-ও কবি পত্নীকে দেওয়া হতো। শান্তিলতা দেবীর উক্তি : "স্ত্রীকে অথরাইজড করা হয়েছিলো। স্ত্রী টাকা তুলতেন।' 'নবযুগ'-এর টাকাও।"

শান্তিলতা দেবীর কাছ থেকে নজরুল জীবনীর এ রকম অনেক তথ্যই পাচ্ছি, যেগুলি এ যাবৎ প্রকাশিত নজরুল স্মৃতিকথাগুলোতে পাই নি। এই সাক্ষাৎকারের তথ্যাদি অবলম্বন ক'রে অনুসন্ধান চালালে আরো অনেক কিছুই জানা যাবে।

আমার এক প্রশ্নের জবাবে শান্তিলতা দেবী বললেন, "কবির অসুস্থতার পর যুক্ত বাংলার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক দু'-একবার কবি পরিবারে এসেছিলেন। কখনো-সখনো ফল, কেক, মাছ পাঠিয়ে দিতেন। তবে নাজিমুদ্দিন, সোহরাওয়ার্দি কখনো আসেন নি।"

www.pathagar.com

অবিভক্ত বাংলার শেষ দুই প্রধানমন্ত্রী — স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে নজরুলের কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গ'ড়ে না ওঠাটা কেবল নজরুলের জন্য নয়, জাতির জন্য-ও দুর্ভাগ্যের হ'য়েছে।

কবি পরিবারকে সুফী জুলফিকার হায়দার কতখানি সাহায্য করেছেন, এ প্রশ্ন শান্তিলতা দেবীকে কথার মাঝে মাঝে আমি একাধিকবার করেছি। প্রতিবারই এই প্রশ্নের জবাবে শান্তিলতা দেবী বলেছেন : "সাহায্য তিনি মাঝে মাঝে উপযাচক হয়ে করতেন। আমরা চাইতাম না।"

সুফী জুলফিকার হায়দার, কালীপদ গুহরায়, হোমেন দত্ত, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক, দৈনিক 'নবযুগ' এবং অল ইন্ডিয়া রেডিও'-র সঙ্গে কবির সম্পর্কের ব্যাপারটা অনুসন্ধান করলে অনেক কিছুই জানা যাবে। বিশেষত কালীপদ গুহরায়ের ভূমিকাটা খুবই রহস্যপূর্ণ। কালীপদ গুহরায়ের সঙ্গে সুফী জুলফিকারের ঘনিষ্ঠতাটা কম রহস্যপূর্ণ নয়। হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুফী জুলফিকার হায়দারের ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারটা খতিয়ে দেখলে না সে সময়কার প্রকৃত অবস্থাটা স্পষ্টত উপলব্ধি করাটা হয়তো সম্ভব হবে না। কেননা, সে সময়ে এঁরাই সাহায্যদাতা।

তবে তিনি নিজে থেকে যাঁর সাহায্যের কথা বারংবার বলেছেন, এমন কি কাজী সব্যসাচী ইসলামের জ্যেষ্ঠা কন্যা খিলখিল কাজী-ও বিভিন্ন সময়ে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যাঁর সাহায্যের কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি দৈনিক 'নবযুগ'-এর অন্যতম সহকারী সম্পাদক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকের খাতা দেখার ব্যাপারে কবির অন্যতম সহযোগী কালীপদ গুহ রায়। কবির অসুস্থতার অনেক আগে থেকেই এই কালীপদ গুহ রায় কবি পরিবারেই থাকতেন, যদিও স্ত্রী পুত্র-কন্যা নিয়ে তাঁর আলাদা একটা সংসার ছিলো। এই ব্যাপারটা-ও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

কবি পরিবারে কালীপদ গুহ রায়ের ভূমিকা এবং কবি সংশ্লিষ্ট তাঁর কাজ-কর্মের ব্যাপারগুলো একটা পৃথক গবেষণার বিষয় হওয়া উচিত। কেননা, এর অনেক কিছুই আমার কাছে রহস্যময় বলে মনে হয়।

কালীপদ গুহ রায় সর্বাধিক সাহায্য করলেও শান্তিলতা দেবী অবশ্য দু'জন সাহায্যকারীর নাম করেছেন। শান্তিলতা দেবীর ভাষায় 'কালীপদ গুহ রায় এবং একজন মাড়োয়ারী ছেলে ছিলো। তাঁর ঘড়ির কারখানা ছিলো। উঁনিও সাহায্য করতেন।"

ঘড়ির দোকান ছিল যে মাড়োয়ারির তিনি কীভাবে কবি পরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হ'য়েছিলেন? কবি পরিবারকে কেন সাহায্য করতেন তিনি, সে বিবরণ শান্তিলতা দেবী দেন নি। কিন্তু এগুলো তো জানা প্রয়োজন!

www.pathagar.com

কীভাবে সংসার চলতো এই প্রশ্নের জবাবে কালীপদ গুহ রায়ের সাহায্যের ব্যাপকতা বোঝাতে তিনি আর এক জায়গায় বলেছেন, "ধারের ওপর সংসার চলতো; আর ছিলো কালীপদ গুহ রায়ের সাহায্য।"

অন্য এক জায়গায় বলেছেন : "কালীপদ গুহ রায় ধার দেনা শোধ করে দিয়েছিলেন।"

যিনি কবি পরিবারেই থাকতেন সেই কালীপদ গুহরায় ব্যাঙ্ক করার মতো আর্থিক সামর্থ কবে কীভাবে অর্জন ক'রে ছিলেন সে বিষয়ে নথি-তথ্য সংগ্রহ করা দরকার। কী ছিল তার ব্যাংকের নাম? এর পুরোনা নথি-তথ্য ঘেঁটে-ও অনেক কিছু পাওয়ার আছে।

শান্তিলতা দেবীর কথায় জানা যায়, কবির অসুস্থতার পর তিনি ব্যাংক করেছিলেন এবং ব্যাংকে যাঁরা টাকা রেখেছিলেন তাঁদের টাকা পয়সা দিয়ে কবি পরিবারে ভরণ-পোষণের জন্য খরচ ক'রেছেন, সাধ-আহ্লাদ মিটিয়েছেন, দেনা-কর্জ শোধ করেছেন।

কিন্তু প্রশ্ন : একটা লোকের আলাদা সংসার থাকা সত্বে-ও এতটা করতে যাওয়ার কারণ কী? তিনি দানবীর, এটা না হয় মানা গেলো। কিন্তু ব্যাঙ্ক ক'রে চিটিংবাজীর টাকা নিয়ে দান? আবার বিশেষত কবি অসুস্থ হওয়ার পর কবির বাড়ির চৌকাঠ না মাড়ানো? একটার সঙ্গে আর একটা কিন্তু সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

শান্তিলতা দেবী সাহায্য-সহযোগিতার, সাধ-আহ্লাদ মেটানোর বর্ণনার পাশাপাশি অন্য একটা কথা-ও অবশ্য বারংবার বলেছেন, কবি অসুস্থ হয়ে পড়লে কালীপদ গুহ রায় আর বাড়ীর চৌকাঠের মধ্যে ঢুকতেন না। কিন্তু সংসার চালানোর, ছেলেদের লেখা-পড়া শেখানোর দায়-দায়িত্ব ছিলো তাঁরই ওপর। তাঁর উক্তি: 'কালীপদ গুহ রায় সবদিক দিয়েই সাহায্য করেছেন। তাঁর সব টাকা, সব রোজগার, আমাদের সখ-আহ্লাদের টাকা-ও তিনিই দিতেন। কবির যখন উদ্দাম অবস্থা, তখন গার্ড রাখতে হয়েছিলো। বদলি হয়ে হয়ে একাধিক গার্ড ছিলো। গার্ডের ব্যবস্থা কালীপদ গুহ রায়ই করেছিলেন। এভাবেই গার্ড হিসেবে 'কাটিয়া' বলে চাকরটা পরে আসে, কবির যখন উদ্দাম অবস্থা।"

যে ভদ্রলোক কবি অসুস্থ হওয়ার পর ঘরের চৌকাঠ মাড়াতেন না, সেই লোকটাই কবি পরিবারের মধ্যে-ও কবিকে শাসনে, নিয়ন্ত্রণে বা জব্দ ক'রে রাখার জন্য গার্ড নিয়োগ করতেন এবং তা-ও ঘন ঘন। ব্যাপারটা রহস্যজনক।

কালীপদ গুহ রায় সম্পর্কে শান্তিলতা দেবী এক জায়গায় বলেছেন, "উঁনাকে কাকা বলতাম। উনি সেই থেকে বাড়ীর চৌকাঠের মধ্যে ঢুকতেন না।"

১৫/৪ শ্যামবাজার স্ট্রীটের বাসায় থাকতেই অনেক নাটকীয় ঘটনা ঘটেছে। বাড়ীটা ছিলো তিন তলা। কবি অসুস্থ হওয়ার পর কালীপদ গুহ রায় বাড়ীর চৌকাঠ

www.pathagar.com

না মাড়ালে-ও কবি পরিবারে কবির ওপর অত্যাচার চালানোর জন্য যেমন গার্ড নিয়োগ করেন এবং ঘন ঘন গার্ড বদল করেন, ঠিক তেমনি ধোঁকা দিয়ে কবিকে লুম্বিনী পার্কে নিয়ে গিয়ে সেখানে দারোয়ান দিয়ে কবির ওপর অত্যাচার করার বন্দোবস্ত করেন।

এই শ্যামবাজার স্ট্রীটের বাড়ীর মালিক ডাক্তার ডি.এল.সরকারই কবির চিকিৎসার ব্যাপারে সর্বাগ্রে এগিয়ে এসেছিলেন।

তিনি কবির অসুস্থতার পর প্রথম কয়েকদিন চিকিৎসা করেছিলেন। এই শ্যামবাজার স্ট্রীটের বাড়ীতে থাকতেই কবিকে মধুপুর পাঠানো হয়, কবির স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে, ডাক্তার ডি.এল.সরকারের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এককালের চিকিৎসক কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থের ওষুধ খেয়ে ৯ অক্টোবর ১৯৪২ তারিখে মহালয়ার দিন কবির উদ্দাম অবস্থা হয়, কবিকে রাজশেখর বসুর ভাই গিরীন্দ্র শেখর বসুর মালিকানাধীন লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হয়। তর্ক তীর্থের ওষুধ খাওয়ানো হয় লুম্বিনী পার্ক থেকে আনার পর।

নতুন ভাড়া বাড়ি ঠিক করতে যাওয়ার নাম ক'রে কবিকে প্রতারণা ক'রে কালীপদ গুহ রায়রা লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালে ভর্তি ক'রে দেন এবং সেখানে এক নেপালী দারোয়ান দিয়ে কবির ওপর অত্যাচার করার বন্দোবস্ত করেন।

শান্তিলতা দেবী বললেন, " বেয়াল্লিশ সালে যখন বোম্বিং হয় তখন লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হয়।" সেখানে অচিকিৎসায় এবং নোংরা অবস্থায় আবদ্ধ থাকার দরুন এবং নেপালী দারোয়ানের অত্যাচারের কারণে কবির শারীরিক ও মানসিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। এই শ্যামবাজার স্ট্রীটের বাড়ীতেই বিভিন্ন সময়ে এক একজন গার্ডের তত্ত্বাবধানে কবিকে একটি কামরায় আটকে রাখা হতো।

মনে রাখা দরকার, এই গার্ড নিয়োগ করতেন কালীপদ গুহ রায় এবং গার্ড তিনি ঘন ঘন বদল করতেন। এই ব্যাপারটা-ও বেশ রহস্যজনক। আমার মনে হয়, কবি যাতে প্রতিবাদ করতে না পারেন সেই জন্য এই ব্যবস্থা।

এই শ্যামবাজার স্ট্রীটের বাড়ীতে থাকতেই কবির শাশুড়ী গিরিবালা দেবী হঠাৎ একদিন তাঁর চশমাটা নিয়েই উধাও হয়ে গেলেন। পরে কেউ কেউ তাঁকে না-কি কাশীতে দেখেছেন। কালীপদ গুহ রায়-ও বেনারস চলে গেলেন।

এই দু'টো ঘটনার মধ্যে একটা যোগসাজস আছে ব'লে কেউ কেউ সন্দেহ করলে সেটা অমূলক ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যাবে কী ক'রে?

এই ১৫/৪ শ্যামবাজার স্ট্রীটের বাসা থেকেই বাড়ীর মালিক এবং কবির প্রথমদিককার চিকিৎসক ডাক্তার ডি.এল. সরকার হঠাৎ একদিন রাত এগারোটায় কবি পরিবারকে পথে নামিয়ে দিলেন। শান্তিলতা দেবীর নিজের উক্তি : "ভাড়ার জন্য জবরদস্তি। রাতারাতি সরিয়ে দিলো। রাত এগারোটায়।"

www.pathagar.com

এই ডাক্তার ডি.এল.সরকারই প্রথম দিকে কবির চিকিৎসা ক'রেছিলেন এবং বাইরে হাওয়া বদল করতে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আরো লক্ষ্যণীয় যে, মধুপুরে তার আর একটা বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা ক'রেছিলেন ডাক্তার সরকার। আবার সেখানে-ও তিনিই কবির চিকিৎসা করতেন।

শান্তিলতা দেবী বলেছেন, "শ্যামবাজার স্ট্রীটের বাড়ী থেকে ভবানীপুরের চক্রবেড়িয়া রোডে কবি পরিবারের আত্মীয় সেনগুপ্ত কাকা তাঁর নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। তিন তলার বাসা। তাঁর স্ত্রী ছিলেন মাদ্রাজী।" শান্তিলতা দেবীর কথায় জানা যায়, তিনি প্রথম কিছুক্ষণ বোধহয় বেজার ছিলেন। তারপর বুঝতে পেরেছিলেন তাঁদের বাড়ীতে জনসাধারণের এক প্রিয়জন উঠেছেন। মাদ্রাজীদের ঝি-এর কাছে কবি এসেছেন শুনে পরের দিন থেকে আশেপাশের মাদ্রাজী বাড়ীগুলো থেকে-ও বহু লোক আসতে লাগলেন ফুল, মিষ্টি ইত্যাকার নানান কিছু নিয়ে।

এ প্রসঙ্গে শান্তিলতা দেবী উক্তি করেছেন : "বউ রাতারাতি চেঞ্জ। তিন তলার ওপরে কবি পরিবার ঐ সেনগুপ্ত পরিবারে একমাস ছিলেন। এর পর যে বাদুড় বাগান লেনের বাসায় এসেছিলেন সে প্রসঙ্গে শান্তিলতা দেবী বললেন : "ওখানে থেকে সুকৃতি সেন যে বাসায় এক তলায় থাকতেন তার দোতলায় বাদুড় বাগান লেনে এলাম। দোতলায় থাকতাম।

বাড়ীর নম্বর ২৮/১, বাদুড় বাগান লেন। বাদুর বাগানে এই বাসাটি ছিলো বাজারের পাশে।"

বাদুড়, বাগান লেনের বাসা থেকে মানিক তলায় রাজেন্দ্র লাল স্ট্রীটের বাসায় যাওয়া প্রসঙ্গে শান্তিলতা দেবী বললেন, "ওখান থেকে মানিকতলায় এক পাহলোয়ানের বাড়ী। তিন তলায় থাকতাম। জল একতলা থেকে তুলতে হতো। বিশ্রী অবস্থা। বিশ্রী পরিবেশ। নীচের তলায় খাটাল। দোতলায় বাড়ীওয়ালা থাকতো। বাড়ীওয়ালার নাম নগেন ঘোষ।"

মানিকতলা এলাকায় এই বাড়ীর নম্বর ছিলো ১৬, রাজেন্দ্র লাল স্ট্রীট। রাজেন্দ্র লাল স্ট্রীটের এই বাসায় থাকতে কবি পরিবার হাজারীবাগে চেঞ্জে গিয়েছিলেন। শান্তিলতা দেবী এই সঙ্গে সেবার বেড়াতে যেতে পারেননি। এর কারণ হিসাবে বললেন : "স্কুলে ছিলাম বলে যাই নি।" শান্তিলতা দেবী ইতোমধ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বজবজে স্কুলে তাঁর মায়ের জায়গায় শিক্ষকতা করতে গিয়েছিলেন। চব্বিশ পরগণা জেলা তখন উত্তর চব্বিশ পরগণা আর দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় ভাগ হয় নি।

রাজেন্দ্র লাল স্ট্রীটের বাসা থেকে টালাপার্কের কাছে মন্মথ দত্ত রোডে একটি নতুন বাসায় যাওয়া স্থির হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে কবি পরিবার

www.pathagar.com

হাজারীবাগ থেকে ফিরে ১৬ নং রাজেন্দ্র লাল স্ট্রীটের বাসা থেকে বজবজে শান্তিলতার কয়লা সড়কের বাসায় একমাস ছিলেন। এ প্রসঙ্গে শান্তিলতা দেবীর নিজের উক্তি : "মন্মথ দত্ত রোডে নতুন বাড়ী হওয়ায় জলের ব্যবস্থা না থাকায় আমার বাড়ীতে বজবজে একমাস ছিলেন।"

উনি বললেন : "আমি এখন থাকি বজবজে নারকেলডাঙা এলাকায় শ্যামপুকুর রোডে মিত্রদের বাড়ী। দোতলা বাড়ী। আমি একতলায় একপাশে থাকি। শান্তিলতা দেবী বললে সবাই চিনবে।

ছেলে বিনয় দাশগুপ্ত। তাঁর স্ত্রী ছেলে-মেয়ে আছে।

দেড় বছর আগে (১৯৮৭-'র মে'র দেড় বছর আগে) আমাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে পেনসন দিয়েছে। আমি কেস করেছি।

আমার ছেলেকে, দুই মেয়েকে কবির স্ত্রীই লালন-পালন ক'রেছেন।

মেয়ের বাড়ী (শান্তিলতা দেবী যেখানে থাকেন সেখান থেকে) পুকুরের ওপারে। (তাঁর) বজবজের বাসা থেকে মন্মথ দত্ত রোডের টালাপার্কের কাছে তিন তলায় ঐ ফ্লাটে যেখানে কল্যাণী কাজীরা আছেন।"

বাসার নম্বর ১৫৬ সি, মন্মথ দত্ত রোড, নর্থ ব্লক, তৃতীয় তল, কলকাতা ৩৭। কবি পরিবার মন্মথ দত্ত রোডের বাসায় থাকতে কবিকে চিকিৎসার জন্য রাঁচী মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হয়। এ প্রসঙ্গে শান্তিলতা দেবী বললেন : "সুস্থাবস্থায় কবি রাঁচী বহুবার গেছেন। রাঁচীতে হিনো হাউসে দু'তিনবার থেকেছেন সুস্থাবস্থায়। শেষবার হিনো হাউস থেকে 'লালপুর' বলে একটা বাড়ীতে উঠেছিলেন কবি। অসুস্থাবস্থায় রাঁচী মানসিক হাসপাতালে গিয়ে কবি ইউরোপিয়ান কটেজে ছিলেন একবছরের-ও বেশি। সঙ্গে আমার মেয়ে ছিলেন সেখানে। হাসপাতালে আমি বহুবার গেছি।"

শান্তিলতা দেবী জানিয়েছেন : "ওখানে কবির চিকিৎসা হয়েছিলো ভালো। সাহেব ডাক্তাররা কবিকে যত্ন নিয়ে দেখতেন। ওখানে কবির যত্ন-আত্যি হয়েছিলো ভালো।"

কাজী সব্যসাচী ইসলাম অল্ ইন্ডিয়া রেডিও'-র কলকাতা কেন্দ্রে চাকরি পাওয়ার সাত-আট বছর পর মন্মথ দত্ত রোড থেকে কবি পরিবারের একটা অংশ কলকাতার ক্রিস্টোফার রোডের সি.আই.টি.বিল্ডিং-এ উঠে যান। কাজী সব্যসাচী ইসলাম সে সময় কবিকে-ও তাঁর সঙ্গে নিয়ে যান। ফ্ল্যাট নং ৪, ব্লক এল, সি.আই.টি.বিল্ডিং, ৪/২ ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা ১৭, এটাই ছিলো বাসার ঠিকানা। এই ঠিকানা থেকে কবিকে ঢাকায় আনা হয়। এই ঠিকানায় কাজী সব্যসাচী ইস্‌লামের কনিষ্ঠা কন্যা মিষ্টি কাজীরা থাকতেন। মন্মথ দত্ত রোডের ঠিকানায় কবির কনিষ্ঠ পুত্র কাজী অনিরুদ্ধ ইস্‌লামের পরিবারের লোকেরাই এখন-ও থাকেন।

www.pathagar.com

১৯৭২-এর ২৪মে (১৩৭৯-এর ১০ জ্যৈষ্ঠ) বুধবার যখন কবিকে ঢাকায় আনা হলো তখন শান্তিলতা দেবী কবি পরিবারের সঙ্গে ঢাকায় আসেন নি। কবি অসুস্থ হওয়ার পর-ও প্রায় বছর দশেক শান্তিলতা দেবী কবি পরিবারে ছিলেন। অর্থাৎ ১৯৫২ সাল বা এর কাছাকাছি সময় পর্য্যন্ত। ১৯৫৩-য় কবির লন্ডন বা ভিয়েনা যাওয়ার আগ পর্য্যন্ত কৃষ্ণ নগরের চাঁদ সড়কের বাসার পর মসজিদ বাড়ি স্ট্রীটের বাসার কথা বলতে পারেন তিনি। এর মধ্যে যে ক'-টা বাসায় কবি ছিলেন সেগুলোর কোনোটির কথাই তিনি বলতে পারেন না। এ সময়ের কথা উল্লেখ করে তিনি বললেন : "মা দু' চার বছর আসতে দেন নি। দশ বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়।"

শান্তিলতা দেবীর কথা থেকেই জানা যায় : মুসলমানদের বাড়ী থেকেই এনে কিছু দিন ঘরে রেখে তাঁর মা বিয়েটা দিয়ে দেন। প্রয়োজন মতো একটা সময় পর্যন্ত মেয়েকে তিনি বাড়ীতেই রাখেন। ঘর জামাই রেখে ছিলেন তিনি। কিছু দিন যাওয়া-আসা করতে করতে শান্তিলতা তাঁর ছেলে-মেয়েদেরকে নিয়ে দীর্ঘদিন কবি পরিবারেই ছিলেন।

এখানে লক্ষ্য করার মতো বিষয় যে, শান্তিলতা দেবী তাঁর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কবি-পরিবারেই থাকতেন। ভদ্রমহিলাকে অসৎ বা কুটিল মনে হয় নি আমার। বরং সহজ-সরলই মনে হ'য়েছে। তবে তাঁর চিন্তা-চেতনায় কোনো গভীরতার ছাপ আমি খুঁজে পাই নি।

আমি এবার-ও তাঁকে প্রশ্ন করলাম : "কবির অসুস্থতার কারণ কী?"

তিনি এবার-ও বললেন : "অতিরিক্ত পরিশ্রম, মস্তিষ্কের খাটুনি, বিশ্রাম নয়, খাওয়া নয়।' দশরথ আসতো। দশরথ বলতো : 'বাবু শুধু চা আর পান খান'।"

"সকালে খেতেন মামলেট, একখানা পরোটা, চা। তা-ও বেরোবার আগে তৈরী না হলে খেতেন না।

শুধু এক কাপ চা খেয়েই চলে যেতেন। কবির জন্য তিনবার রান্না হলো।

সকালে, দুপুরে এবং বিকেলে এবং প্রতিবারই রান্না আলাদা করেই হলো। ছাঁকা তেলে উচ্ছে ভাজা, চিংড়ী মাছের মালাই কারী, ঝরঝরে খিচুড়ী, ঝিঙে পোস্ত।

কিন্তু এলেন না। এলেন রাত এগারোটা, বারোটায়।

সব কিছুই দেওয়া হতো। কিন্তু খেতেন খুব সামান্যই। বাইরে-ও চা এবং পান ছাড়া আর কিছু খেতেন না। পঞ্চাশ-ষাটটি খিলি পান সেজে দিতাম।"

কবির খাটা-খাটুনির এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে অসাধারণত্বের এবং অস্বাভাবিকত্বের অনেক কিছুই আছে। এ সব অনেক কিছুই এ যাবৎ নজরুল জীবনীতে আসে নি। অথচ আসা দরকার ছিল।

www.pathagar.com

কবির ওপর কোনো শারীরিক হামলা হয়েছিলো কিনা এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, "শারীরিক হামলা দেখিওনি, শুনিওনি।"

এ রকম ঘটনার কথা কিন্তু ইতোপূর্বে অনেক আগে ছাপা হ'য়েছে। কলকাতার কাগজে-ও ছাপা হ'য়েছে। অবশ্য তারা সেটা না দেখতে-ও পারেন এবং না শুনতে-ও পারেন।

"দৈনিক 'নবযুগ' অফিসে গিয়ে কবি কি মোরাকাবা করেছিলেন?" এ প্রশ্নের জবাবে শান্তিলতা দেবী বললেন : "নবযুগ' অফিসে গিয়ে মোরাকাবার কথা বলতে পারি না'। তবে গুরু বরদাচরণ মজুমদার বলেছিলেন : "আপনি যদি সাধনা করেন তা হলে আপনার স্ত্রী ভালো হয়ে যাবেন।

রাতে বাসায় ফিরে হাত মুখ ধুয়ে স্ত্রীর মাথার কাছে ধ্যনস্থ্ হয়ে বসতেন। তখন এমন একটা মূর্তি হতো যে, কবির স্ত্রী ভয় করতেন। ঘরে কবি গেলে আমরা উসখুস করতাম কী করে ঢুকবো।"

পারিবারিক জীবনে তাঁর ভরসাস্থল, তাঁর আশ্রয়স্থল যেটুকু ছিল সে তো কেবল তাঁর পত্নীই। তাই এই বিপদগ্রস্ত ও ব্যস্ত মানুষটি স্ত্রীর রোগমুক্তি কামনা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েই করতেন।

"কবি কি কালী সাধনা করতেন", আমার এ প্রশ্নের জবাবে শান্তিলতা দেবী স্পষ্টতই বললেন : "কবি কালি সাধনা করতেন না। পূজো-অর্চনার সময় বা অন্য কোনো সময় আমরা বললে কবি দক্ষিণেশ্বরে কালি মন্দিরে নিয়ে যেতেন আমাদেরকে। অসুস্থতার পরে একবার দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলেন। অসুস্থতার পর এক রাতে আসেন নি। পায়ে হেঁটে দক্ষিণেশ্বর যান। নিজেই বললেন : "মা আমাকে ডাকছেন, স্বপ্নে দেখলাম। কিন্তু সেটা মাথা খারাপ হওয়ার পর। সুস্থাবস্থায় নয়।"

এ বিষয়ে কারো কারো মনে ভ্রান্ত ধারণা থাকলে, এর পর নিশ্চয়ই সে সবের অবসান ঘটবে। অবশ্য নজরুল জীবন ও সৃষ্টি বিষয়ে গভীর পড়াশুনা থাকলে এ ধরণের কোনো ভ্রান্ত ধারণা, বা কোনো গুজব বা কল্প কাহিনী মনে ঠাঁই পাওয়ার কথা নয়। কেননা, তাঁর সৃষ্টিতে কবি স্পষ্টতই নিজের পরিচয় দিয়েছেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং নবীর উম্মত। যে কাগজে কাজ করতে কবি হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়েন সেই দৈনিক 'নবযুগ'-এ তাঁর প্রায় প্রতিটি লেখায় আল্লাহর কথা আছে। কোনো কোনো লেখায় আছে একাধিক বার।

এক প্রশ্নের জবাবে শান্তিলতা দেবী বলেছেন : "বাড়ীতে গিরিবালা দেবীর আত্মীয়-স্বজনের ভিড় হতো।"

www.pathagar.com

মুসলমান ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়ায় তাঁর আত্মীয়-পরিজনরা এক সময় তাঁকে প্রায় এক ঘরে ক'রে রেখেছিলেন। কবির প্রতিষ্ঠা এবং আর্থিক স্বাচ্ছল্য আসলে এই বৈরী ভাবের অবসান ঘটে।

বিধবা গিরিবালা দেবী কবির সঙ্গে তাঁর কন্যার বিয়ে দিয়ে সেনগুপ্ত পরিবারের ভার বোঝা হয়ে আবার দায় থেকে বোধহয় এক সময় মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। সে মুক্তি যে তিনি এক সময় পুরোপুরিই পেয়েছিলেন সেটা-ও তিনি সুযোগমতো দেখাতে চেয়েছিলেন। সম্ভবত তিনি সব কিছুতে এটা-ও দেখাতে চেয়েছিলেন যে, তিনি কখনোই কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নেন নি, বিশেষত তাঁর মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে।

তাস খেলা প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন : "এগারোটা-বারোটায় বাড়ী এলেন। (এত রাতে বাড়ী ফেরার পর-ও) কখনো কখনো সারা রাত তাস খেলতেন। ব্রে,ব্রীজ। রাত দু'টো আড়াইটা, কখনো কখনো তিনটা-চারটা পর্যন্ত তাস খেলতেন। কবি উঠতেন সকাল আটটায়।"

কবি যতই রাত জাগুন না কেন, সকালে ঘুম থেকে উঠতেন প্রায় ঠিক সময়েই। এবং সকালে সেই সময়টা ছিল আটটায়।

কবি কী ধরণের কাপড় চোপড় পড়তেন সে কথা-ও ব'লেছেন তিনি।

শান্তিলতা দেবী বলেছেন, "কবি পরতেন কখনো পাঞ্জাবী, কখনো নাগরা জুতো।"

পিতৃপ্রতিম মনে করলে-ও শান্তিলতা দেবী কবিকে "মেসো" বলতেন। কবি পত্নীকে বলতেন "মাসি"। কবি তাঁকে ডাকতেন "খুকী" বলে। তার ভাই বিজয় সেনগুপ্তকে কবি ডাকতেন "খোকা" বলে।

এই বিজয় সেনগুপ্ত বা খোকার কথা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের "কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা"-য় আছে। সুফী জুলফিকার হায়দারের স্মৃতিকথা "নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়"-এ-ও আছে।

হরি ঘোষ স্ট্রীটে থাকতেই কাজী সব্যসাচী ইসলাম এবং কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম আদর্শ বিদ্যামন্দিরে পড়তেন।

কবি আবদুল কাদিরের কাছে শোনা একটা ঘটনার কথা অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সাহেব একদিন আমাকে বলেছিলেন। কবির শাশুড়ী প্রসঙ্গে অতিরিক্ত কল্পনাপ্রসূত গল্প। এটা যে কবিকে না বোঝার ফলে কিংবা ঈর্ষার কারণে, সে কথা আজরফ সাহেবকে যখন বিস্তারিত বললাম তখন তিনিও সেটা স্বীকার করলেন। সেই কথাটাই আমি শান্তিলতা দেবীকে জিজ্ঞেস করে দেখলাম।

www.pathagar.com

তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন : "এ রকম ধরণ এ বাড়ীর ছিলোই না। স্ত্রীর সঙ্গে কবিকে একটা জোরে কথা বলতে শুনিনি।"

বাড়ীর পরিবেশের কথা বলতে গিয়ে তিনি আরো বললেন : "হৈ হৈ করে হাসা কবি পছন্দ করতেন না।"

অনেকটা নীরবে হ'লে-ও কবি তাঁর পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারটা ঠিকই জানিয়ে দিতেন। এবং পরিবারের লোকেরা-ও সেটা অবশ্যই মান্য করতেন বা গুরুত্ব দিতেন।

শান্তিলতা দেবী কবি পরিবারের একটা ঘটনার কথা বললেন। ঘটনাটি ঘটেছিলো হরিঘোষ স্ট্রীটের বাসায় থাকতে। কবির অনুপস্থিতিতে দু'জন লোক হীরের গহনা রেখে গিয়েছিলেন বাসায়। কবি দিয়ে পাঠিয়েছেন এ কথাই বলেছিলেন তাঁরা। কবি বাসায় এসে এই ঘটনার কথা শুনে খুবই অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। বলেছিলেন, "অপরিচিত কেউ কোনো জিনিস দিয়ে গেলে আমরা যেনো না রাখি।"

তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কেউ বা কোনো কোনো মহল যে ষড়যন্ত্র করতে পারে সেটা কবি বুঝতেন। কবি সহনশীল ছিলেন কিন্তু অসচেতন ছিলেন না। সে যাই-ই হোক,এই ঘটনার বিবরণে শান্তিলতা দেবী আরো ব'ললেন :

"এর পর ভবানীপুর থানা থেকে ওসি এসেছিলেন। ঘৃণায়, ক্ষোভে কবি কিছুতেই দারোগার সামনে দেখা দিতে, কথা বলতে চাইলেন না। বললেন, 'তোমরা রেখেছো, তোমরাই কথা বলো।'

আমরা দেখলাম, আমাদের আত্মীয় ওসি। আমার বড় মামীর ভগ্নীপতি। তিনি জানালেন, 'ঐ লোকদের তাঁরা ধরেছেন।"

কবির চরিত্রবৈশিষ্ট্য, স্বভাব সম্পর্কে শান্তিলতা দেবী একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন, "কলকাতার কলেজ স্ট্রীটে বৈকুণ্ঠ গুঁইয়ের কাপড়ের দোকান ছিলো। কবি কাপড় কিনতেন বৈকুণ্ঠ গুঁইয়ের দোকান থেকে।

বৈকুণ্ঠ গুঁই একবার খারাপ ব্যবহার করলে আমরা নিষেধ করলাম ঐ দোকান থেকে কাপড় কিনতে।

একদিন দেখলাম, বাচ্চাদের পোশাক এনেছেন কবি। কোথা থেকে এনেছেন বলতে চান না। পীড়াপীড়ি করায় জানালেন, বৈকুণ্ঠ গুঁইয়ের দোকান থেকেই এনেছেন। আমরা বললাম, এই রকম খারাপ ব্যবহার করেছেন, আবার তার দোকান থেকে কাপড় এনেছেন? তিঁনি বললেন : 'ওসব কি মনে রাখলে চলে?"

তাঁর কথাতেই জানলাম : কবি কোনো ব্যক্তি মানুষকে শত্রু হিসাবে সনাক্ত করে রাখতেন না। কারো খারাপ ব্যবহার, দুর্ব্যবহার স্মরণ করে ব্যবধান রচনা করে চলতেন না।

www.pathagar.com

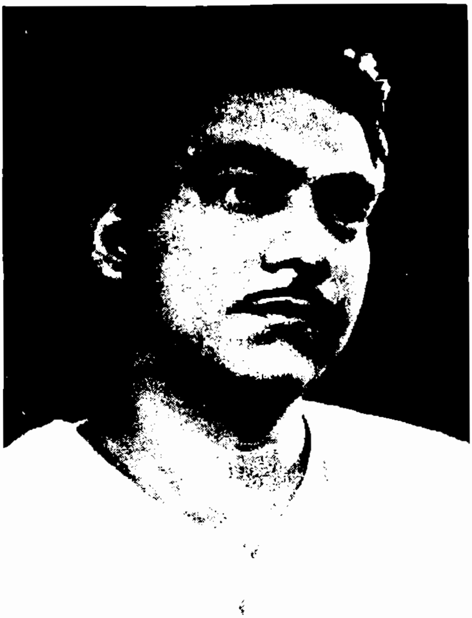

কবির তৃতীয় পুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলাম

কবির চতুর্থ পুত্র কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম

www.pathagar.com

www.pathagar.com